মে ২০২৩ ■ বৈশাখ- জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

# নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

## ‘জুলিও কুরি শান্তি পদক’ প্রাপ্তির ৬০ বছর

**মীর্জা মাহের আসেফ**, পঞ্চম শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

**মো. তাহমিদ জামান**, দ্বিতীয় শ্রেণি, মতিঝিল আডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

# সম্পাদকীয়

বন্ধুরা, এবারের সংখ্যাটি আমরা সাজিয়েছি বঙ্গবন্ধুর 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক প্রাপ্তির ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে। বিশ্বশান্তির জন্য সর্বোচ্চ পদক হলো 'জুলিও কুরি' পদক। বিশ্বের বরেণ্য ব্যক্তিরাই এ পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৭২ সালে ১০ই অক্টোবর চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোতে বিশ্বশান্তি পরিষদে ১৪০টি দেশের ২০০ প্রতিনিধি সর্বসম্মতিক্রমে বঙ্গবন্ধুকে 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৭৩ সালে মে মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি পরিষদের 'এশিয়ান পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি কনফারেন্স' উপলক্ষ্যে ২৩শে মে বঙ্গবন্ধুকে 'জুলিও কুরি' পদক প্রদান করা হয়। সেদিন থেকেই বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্বীকৃত বিশ্ববন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যা পুরো বাঙালির জন্য অত্যন্ত গর্বের।

১লা মে বিশ্বব্যাপী পালিত হয় মহান মে দিবস। ১৮৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটে শ্রমিকরা তাঁদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের ৮ কর্মঘণ্টার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এরপর থেকে সারা বিশ্বে 'মে দিবস' পালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে এবারের মে দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে– 'শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি'। ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে মে দিবসকে জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন। এরপর থেকে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়ে আসছে মে দিবস।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মমভাবে সপরিবারে হত্যা করে। এ সময় বিদেশে থাকায় ঘাতকদের হাত থেকে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। দীর্ঘ ৬ বছর নির্বাসনে থাকার পর ১৯৮১ সালের ১৭ই মে প্রিয় মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন শেখ হাসিনা। তাই মে মাসের ১৭ তারিখ শেখ হাসিনার 'স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস' হিসেবে আমাদের জাতীয় জীবনে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

বন্ধুরা, ২৫শে বৈশাখ ১৪৩০ বাংলা সাহিত্যের প্রাণপুরুষ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২তম জন্মবার্ষিকী। অন্যদিকে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪তম জন্মবার্ষিকী ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০। আমরা প্রিয় দুই কবিকে স্মরণ করি পরম শ্রদ্ধার সাথে।

মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার পালিত হয়ে আসছে বিশ্ব মা দিবস। মা পৃথিবীর সবচেয়ে আপন ও প্রাণের একটি শব্দ। আর তাই মা দিবসকে স্মরণ করে প্রতিটি দিন যেন হয়ে ওঠে মাকে ভালোবাসার দিন।

ভালো থেকো বন্ধুরা, তোমাদের জন্য শুভকামনা।


**প্রধান সম্পাদক**
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

**সিনিয়র সম্পাদক**
ডালিয়া ইয়াসমিন

**সম্পাদক**
নুসরাত জাহান

**সিনিয়র সহ-সম্পাদক**
শাহানা আফরোজ

**সহ-সম্পাদক**
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

**সহযোগী শিল্পনির্দেশক**
সুবর্ণা শীল

**অলংকরণ**
নাহ্‌রীন সুলতানা

**সম্পাদকীয় সহযোগী**
মেজবাউল হক
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

**যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা**
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

**বিক্রয় ও বিতরণ**
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

**মূল্য : ২০.০০ টাকা**

**মুদ্রণ : রূপা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং**
২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।

# সূচিপত্র

## নিবন্ধ


জুলিও কুরি পদক ও বঙ্গবন্ধু/দুখু বাঙাল ০৩
'জুলিও কুরি শান্তি পদক' প্রাপ্তির ৫০ বছর/দেলওয়ার বিন রশিদ ১৪
বঙ্গবন্ধু যখন বিশ্ব বন্ধু/মিলি হক ২২
মা দিবসের কথা/মেজবাউল হক ৩২
জাতীয় সংগীতের ইতিবৃত্ত/মোহাম্মদ ইল্‌ইয়াছ ৩৩
নজরুল ও বঙ্গবন্ধু : হৃদকমলের টানে/পীযূষ কুমার ভট্টাচার্য্য ৩৫
বঙ্গবন্ধু বিশেষ সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত/তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা ৩৯
ফিরে এল তালপাতার পুঁথি/তাসীন মাহমুদ ৪৫
সুন্দরবনে মধ্যযুগীয় স্থাপনা/শরীফউদ্দিন হাওলাদার ৪৬


## গল্প


বঙ্গবন্ধুর ডাক/সুজন বড়ুয়া ০৯
এক মহানায়কের গল্প/অমিত কুমার কুণ্ডু ১৯
মায়ের চোখ/ইমরুল ইউসুফ ২৭


## সাফল্য প্রতিবেদন


জীববৈচিত্র্য দিবস/শাহানা আফরোজ ৪৯
শব্দদূষণ এড়িয়ে চলি/রেবেকা জাহান ৫১
ফোর্বসে বাংলাদেশি ৭ তরুণ উদ্যোক্তা/ইব্রাহিম রাজু ৫৩
গরমে শিশুর যত্ন/মো. জামাল উদ্দিন ৫৫
ইজিএমওতে আমাদের অর্জন/জান্নাতে রোজী ৫৭
দশদিগন্ত/সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি ৫৮
বুদ্ধিতে ধার দাও/ নাদিম মজিদ ৬১


## কবিতা ও ছড়া


০৮ সুজিত হালদার
২৫ অবিনাশ আচার্য
২৬ চন্দনকৃষ্ণ পাল
৩১ নুসরাত জাহান


## ছোটোদের ছড়া


২৬ তৌফিক আলম তুহিন
৩১ মো. রিদওয়ানুল ইসলাম
৫৪ মিনহাজুল নূর


## মুক্তিযুদ্ধের কিশোর উপন্যাস


৪১ রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনী/মুস্তাফা মাসুদ


## ছোটোদের আঁকা


শেষ প্রচ্ছদ : আফিফা মাইমুনা
দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : মীর্জা মাহের আসেফ/মো. তাহমিদ জামান
তৃতীয় প্রচ্ছদ : সালিমা রহমান/সাবা তাসনিম
৫০ মুহাম্মদ ইউনুস অর্ক
৬০ মৌমিতা আক্তার বন্যা
৬৩ স্নেহা চৌধুরী/সিরাজুল মুনিরা বিভা
৬৪ রিজওয়ান আল রাহাত/সায়মা আনজুম


নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় Nobarun Potrika আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে।

এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

# জুলিও কুরি পদক ও বঙ্গবন্ধু

দুখু বাঙাল

মানুষ শান্তির পিয়াসি। বিশ্বে শান্তির জন্য সর্বোচ্চ সম্মাননা 'জুলিও কুরি' পদক। বিশ্বশান্তি পরিষদ ১৯৫০ সাল থেকে ফ্যাসিবাদ বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে, মানবকল্যাণে এবং শান্তির পক্ষে অবদানের জন্য বরণীয় ব্যক্তি ও সংগঠনকে শান্তি পদকে ভূষিত করে আসছে। ১৯৫৮ সালে ফরাসি পদার্থবিজ্ঞানী জঁ ফ্রেডেরিক জুলিও কুরির মৃত্যুর পর তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্বশান্তি পরিষদ তাঁদের পদকের নাম পরের বছর থেকে রাখে 'জুলিও কুরি'। ফ্রেডেরিকের মূল নাম ছিল

জঁ ফ্রেডেরিক জুলিও এবং তাঁর স্ত্রী ছিলেন ইরেন কুরি। বিয়ের পর ইরেন ও ফ্রেডেরিক উভয়ে পদবি গ্রহণ করেন। একজনের নাম হয় জঁ ফ্রেডেরিক জুলিও কুরি এবং অন্যজনের নাম ইরেন জুলিও কুরি। তাঁরা দুজনেই ছিলেন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী। ইরেনের মা-বাবাও বিখ্যাত নোবেলবিজয়ী বিজ্ঞানী দম্পতি মাদাম কুরি ও পিয়েরে কুরি।

এক সংগ্রামী জীবন নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ছাত্রাবস্থা থেকেই রাজনীতি-সচেতন ছিলেন এবং গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্যে এসে জড়িয়ে পড়েছিলেন সক্রিয় রাজনীতিতে। তিনি ছিলেন ন্যায়ের পক্ষে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে। তাঁর জীবন নিবেদিত ছিল দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য। নিজের জীবনের সুখ-শান্তি-হেলায় উপেক্ষা করেছেন তিনি। বাংলার মানুষের দুঃখ মোচনের লড়াইয়ে অকুতোভয় ছিলেন বলেই তিনি ১৯৬৯ সালে হয়ে উঠেন বাঙালির চিরদিনের আপনজন– বঙ্গবন্ধু। ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেই বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা। বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। জন রায়ে তাঁরই হওয়ার কথা পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান বাঙালির হাতে শাসনক্ষমতা অর্পণ না করে চাপিয়ে দেন এক বর্বর যুদ্ধ।

গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামী নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে অনেকটা বাধ্য হয়েই যুদ্ধের মোকাবিলায় ডাক দিতে হয় জনযুদ্ধের। শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেয় প্রতিবেশী দেশ ভারত। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী অকৃত্রিম বন্ধুর মতো বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের পক্ষে দাঁড়ান। বাংলাদেশ পায় সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সমর্থন। বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হলেও তিনি হয়ে উঠেন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক। নয় মাসের রক্তাক্ত যুদ্ধ শেষে অর্জিত হয় বাঙালির স্বাধীনতা। এভাবেই বঙ্গবন্ধু দৃষ্টি কাড়েন বিশ্ববাসীর। শান্তির প্রতি বঙ্গবন্ধু বরাবরই ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় তিনি ছিলেন কারাগারে। ১৯৫২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি তিনি মুক্তি পান। ওই বছরেই অক্টোবরে চীনে অনুষ্ঠিত হয় 'পিস কনফারেন্স অব দ্য এশিয়ান অ্যান্ড প্যাসিফিক রিজিওনস'। বঙ্গবন্ধু এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। ৩৭টি দেশ থেকে আগত শান্তি আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে তাঁর মতবিনিময়ের সুযোগ হয়েছিল। ১৯৫৬ সালে স্টকহোমে বিশ্বশান্তি পরিষদের সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। এই সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন– 'বিশ্বশান্তি আমার জীবনের মূলনীতি। নিপীড়িত, নির্যাতিত, শোষিত ও স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানুষ, যে-কোনো স্থানেই হোক না কেন, তাদের সঙ্গে আমি রয়েছি। আমরা চাই বিশ্বের সর্বত্র শান্তি বজায় থাকুক, তাকে সুসংহত করা হোক।'

বঙ্গবন্ধু সরকারের অবস্থান ছিল কোনো সামরিক জোটে যোগ না দেওয়া। তিনি স্পষ্ট করে বলেছিলেন– 'আমরা সর্বপ্রকার অস্ত্র প্রতিযোগিতার পরিবর্তে দুনিয়ার সকল শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের কল্যাণে

'বঙ্গবন্ধু' উপাধি পাওয়া আবেগঘন মুহূর্ত

বিশ্বাসী বলেই বিশ্বের সব দেশ ও জাতির বন্ধুত্ব কামনা করি। সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের এই নীতিতে আমরা আস্থাশীল। তাই সামরিক জোটগুলোর বাইরে থেকে সক্রিয় নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি আমরা অনুসরণ করে চলেছি।'

১৯৭২ সালের ১০ই অক্টোবর চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোয় বিশ্বশান্তি পরিষদের প্রেসিডেন্সিয়াল কমিটির সভায় বাঙালি জাতির মুক্তি আন্দোলন এবং বিশ্বশান্তির সপক্ষে বঙ্গবন্ধুর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'জুলিও কুরি পদক'– প্রদানের জন্য বিশ্বশান্তি পরিষদের মহাসচিব রমেশ চন্দ্র প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। বিশ্বের ১৪০টি দেশের শান্তি পরিষদের ২০০ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুকে 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৭৩ সালের ২৩শে মে ঢাকায় আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আসা বিশ্বশান্তি পরিষদের প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় বিশ্বশান্তি পরিষদ আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশ্বশান্তি পরিষদের তৎকালীন মহাসচিব রমেশচন্দ্র বঙ্গবন্ধুকে জুলিও কুরি পদক প্রদান করেন এবং বলেন– 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শুধু বঙ্গবন্ধু নন, আজ থেকে তিনি বিশ্ববন্ধুও বটে।' সেদিন থেকেই বাঙালি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্বীকৃত বিশ্ববন্ধু শেখ মুজিব। এই অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন– 'এ সম্মান কোনো ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয়। এ সম্মান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মদানকারী শহিদদের, স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর

সেনানীদের। 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক সমগ্র বাঙালি জাতির।'

বঙ্গবন্ধু ছাড়াও 'জুলিও কুরি' শান্তি পদকে ভূষিত হয়েছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু, ভিয়েতনামের বিপ্লবী কমিউনিস্ট নেতা হো চি মিন, চিলির সমাজবাদী প্রেসিডেন্ট সালভেদর আলেন্দে, ফিলিস্তিনের জনপ্রিয় নেতা ইয়াসির আরাফাত, বিখ্যাত আফ্রিকান-আমেরিকান মানবতাবাদী নেতা মার্টিন লুথার কিং, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট ও কৃষ্ণাঙ্গ নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা, চিলির বিখ্যাত কবি ও কূটনীতিক পাবলো নেরুদা, কিউবার প্রেসিডেন্ট ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ত্রো প্রমুখ।

> বাংলার মানুষের দুঃখ মোচনের লড়াইয়ে অকুতোভয় ছিলেন বলেই তিনি ১৯৬৯ সালে হয়ে উঠেন বাঙালির চিরদিনের আপনজন– বঙ্গবন্ধু। ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেই বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা।

বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের উত্থান আর বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিরুদ্ধে ক্রমাগত ষড়যন্ত্রের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিরোধিতা করে বিশ্ব পরাশক্তির একাংশের যে অমানবিক অবস্থান, তার পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন– 'বৃহৎ শক্তিবর্গ, বিশেষভাবে আগ্রাসী নীতির অনুসারী কতিপয় মহাশক্তির অস্ত্রসজ্জা তথা অস্ত্র প্রতিযোগিতার ফলে আজ এক সংকটজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।' বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তার প্রতিক্রিয়া নিজেই দেখেছেন। সে সময় তিনি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দুস্থ ও অনাহারীদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে গেছেন। সেই অভিজ্ঞতা তাঁর আছে। 'আমরা চাই, অস্ত্র প্রতিযোগিতায় ব্যয়িত অর্থ দুনিয়ার দুঃখী মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যয় করা হোক। তাহলে পৃথিবী থেকে দারিদ্র্যের অভিশাপ মুছে ফেলার কাজ অনেক সহজসাধ্য হবে।' এটি তাঁর প্রত্যাশাই শুধু নয়, নিজের ক্ষুদ্র সামর্থ্যে এগিয়ে আসাও। তাই স্বাধীনতার পর তিনি প্রথমে জোর দিয়েছিলেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ওপর। বঙ্গবন্ধু স্পষ্টত বলেছিলেন,

পৃথিবী আজ দুই ভাগে বিভক্ত। আমি শোষিতের পক্ষে। তিনি এটাও বলেছিলেন– প্রয়োজনে আন্দোলনের পরিণতি বরণ করব, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের কাছে মাথা নত করব না।

বিশ্বশান্তি পরিষদের মহাসচিব রমেশচন্দ্র ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শুভেচ্ছা বিনিময়

কেউ কেউ বলে থাকেন একাত্তরে বাঙালির জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে কি বাঙালি ছিল না? শত-শতাব্দীকাল অবজ্ঞার শিকার অবিন্যস্ত বিশৃঙ্খল এবং পথহারা ম্লানমুখো মানবগোষ্ঠীই ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের আবিষ্কার ও উদ্ধারের বিষয়। বাঙালির জীবনে ভিন্ন ক্ষেত্র ও প্রেক্ষাপটে মহত্তম প্রতিভার বিকাশ ঘটলেও ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে জাতিভিত্তিক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা একদমই অতুলনীয় এবং অনন্য। ভারতবর্ষে অহমিয়া, কাশ্মীরি, পাঞ্জাবি, বেলুচি, তামিল, তেলেগু, মারাঠিসহ অনেক জাতির অস্তিত্ব থাকলেও বাঙালিই কেবল স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধিকারী। মনে রাখতে হবে, বঙ্গবন্ধুর হাতেই ঘটেছে নিজ দেশে পরবাসী, পরভাষী বাঙালির আত্মপরিচয় সংকটের অবমোচন; যে কারণে তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং বাঙালি জাতির পিতা। বাঙালি জাতির পিতা কখনও মাথা নত করেননি, জীবন দিয়ে তিনি তা প্রমাণ করে গেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক প্রদান করে বিশ্বশান্তি পরিষদ নিজেরা ধন্য হয়েছে। এই পদক প্রাপ্তির সুবর্ণজয়ন্তীতে বঙ্গবন্ধুর প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা।■

প্রাবন্ধিক ও শিশুসাহিত্যিক

# শ্রমিকের কষ্টার্জিত ঘামে

সুজিত হালদার

প্রিয় শ্রমিক তোমার কষ্টার্জিত ঘামে
ফুটেছে বসন্তের ফুল গ্রীষ্মের নীলাঞ্জনা
অহংকারের কৃষ্ণচূড়ায় ফুটেছে সমুন্নত শির
তবু থুবড়ে পড়েছে বিপ্লবী চেতনার ক্ষুধার্ত মুখ
পরনের আশ্রিত বস্ত্র শতাব্দীর লাঞ্ছিত চোখ।

কংক্রিটের শক্ত ইমারত গড়তে
রোদ সেঁকে নেয় তোমার বজ্র ইস্পাতের শরীর
বৃষ্টি ধুয়ে দেয় তোমার ঘর্মাক্ত লোমকূপ।

হাতুড়ি খুন্তি কাস্তে শাবল আপন বলে গড়েছ
আগুনে পুড়িয়ে পুড়িয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে করেছ লাল
সূর্য আঁকা পতাকার বর্ণিল ছবি উড়িয়েছ সময়ের পাল
কারখানার শ্রমিক তোমার কালি মাখা মলিন বস্ত্রের হাল।

তোমার ঘামের মূল্য চাই যথাযোগ্য মর্যাদায়
মহাজনি হৃদয়ের ভাঁজে লুকিয়ে থাকা খরগোশকে
ফোটাতে হবে সবুজ তৃণের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত ফুল
শ্রমের মর্যাদা বীরোচিত আত্মত্যাগ বিনিময়ের ঐক্য।

# বঙ্গবন্ধুর ডাক

সুজন বড়ুয়া

শহীদুল আলম ইতিহাসের শিক্ষক। স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণিতে ইতিহাস পড়ানোই তার প্রধান কাজ। ইতিহাসের সব বিষয়-আশয়, সন-তারিখ, ঘটনা-তথ্য তার একেবারে মুখস্থ। বলতে গিয়ে একটুও তার মুখে আটকায় না। খুঁটিনাটি সব বিষয় বুঝিয়ে বলেন একে একে। ছাত্ররাও শোনে মন্ত্রমুগ্ধের মতো।

এখন সেভেনের ইতিহাস ক্লাস। ক্লাসে ঢুকেই শহীদুল আলম বললেন, গত ক্লাসে তোমাদের কী পড়িয়েছিলাম মনে আছে তো?

ক্লাসের ছাত্ররা প্রায় সমস্বরে বলে উঠল, স্যার মনে আছে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনকথা পড়াচ্ছিলেন।

–হ্যাঁ, ঠিক, আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন, সংগ্রাম ও আদর্শের কথা বলছিলাম। তাঁর জীবন যেমন ঘটনাবহুল, তেমনি বিচিত্র। তাঁর মতো মহান নেতা যুগে যুগে জন্ম নেন না। কয়েক শতাব্দী পর হয়ত একজন জন্ম নেন। দেশ ও জাতির কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়ে স্মরণীয় হন। ইতিহাস সৃষ্টি করেন। বঙ্গবন্ধুও তেমনই একজন। তাঁর জীবনকথা রূপকথাকে হার মানায়। আর সেজন্যই তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহানায়ক এবং আমাদের জাতির পিতা। এমন মহান বীর-নেতার সব কথা এক ক্লাসে বলে শেষ করা যায় না। যতই বলি, তবু মনে হয় আরো কিছু বাকি রয়ে গেল। আমাদের জাতির পিতা সম্পর্কে এরকমই কিছু কথা আজ তোমাদের বলব। তিনি ছিলেন বিশ্বের শোষিত-নিপীড়িত মানুষের মুক্তির প্রতীক, শান্তির দূত। বিশ্বব্যাপী তিনি মানুষের অসীম ভালোবাসা পেয়েছেন, অবদানের স্বীকৃতি পেয়েছেন। এসব সম্মাননা, স্বীকৃতি ও পুরস্কার তাঁর জীবনকে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। তাঁর এ দিকটিও আমাদের জানা দরকার। আজ তেমন একটি সম্মাননার কথা তোমাদের বলব। এই সম্মাননার নাম 'জুলিও কুরি শান্তি পদক'।

ক্লাসের ছাত্ররা একেবারে নিশ্চুপ। প্রতিদিনের মতোই সবাই স্যারের কথা শুনছে গভীর আগ্রহের সঙ্গে। এর মাঝে ক্লাসের ফার্স্টবয় শোভন কেমন যেন একটু উশখুশ করে উঠল।

'জুলিও কুরি শান্তি পদক' গ্রহণের জন্য দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে যাচ্ছেন বঙ্গবন্ধু

শহীদুল স্যার বললেন, কী শোভন, তুমি কিছু বলতে চাও মনে হয়, কিছু বলবে?

–স্যার বলব। শোভন দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করে, স্যার, 'জুলিও কুরি শান্তি পদক' কথাটি আমি বইতে পেয়েছি। কিন্তু ভালোভাবে বুঝিনি। আপনি বললে আমরা খুব উপকৃত হব।

শহীদুল স্যার বললেন, বসো। তবে তোমরা সবাই মন দিয়ে শোনো। তোমরা জানো, মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দি করে পাকিস্তানে নিয়ে গিয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পর পাকিস্তানিরা তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

পাকিস্তান কারাগার থেকে ছাড়া পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে এলেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়ে দেশ গঠনের কাজ শুরু করলেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের যেসব মানুষ পাকিস্তানে হানাদার বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের পাশে ছিল, তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সেসব মানুষকে সাধারণ ক্ষমা করে দিলেন। ক্ষমা মহত্ত্বের লক্ষণ। তিনি ভাবলেন, সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ, সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে কাজ করলে দেশের দ্রুত উন্নয়ন করা সম্ভব হবে। একইভাবে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় যেসব দেশ বাংলাদেশকে সমর্থন করেনি, পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেছে, বঙ্গবন্ধু সেসব দেশের সঙ্গেও বন্ধুসুলভ সম্পর্ক গড়ে তোলার নীতি গ্রহণ করলেন। বঙ্গবন্ধু শান্তি ও ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নিলেন। ফলে অল্প সময়ে বাংলাদেশ সমগ্র বিশ্বে বিশেষ মর্যাদা লাভ করল। বঙ্গবন্ধুর শান্তিময় পররাষ্ট্র নীতি বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হতে লাগল। বিশ্বনেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর উদার শান্তি নীতির প্রতি সমর্থন জানাতে শুরু করল।

১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোতে বিশ্বশান্তি পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় বিশ্বশান্তি পরিষদের ১৪০টি দেশের ২০০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় উপস্থিত সকল সদস্যের সর্বসম্মতিক্রমে সেদিন বঙ্গবন্ধুকে জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এটুকু শুনে শোভন আবার উঠে দাঁড়ালো, স্যার, যাঁর নামে এই পদক প্রদান করা হয়, সেই জুলিও কুরি কে?

শহীদুল স্যার এবার মৃদু হাসলেন, বাহ্, শোভন, তোমার আগ্রহ দেখে আমার খুব ভালো লাগছে। তারপর স্যার ক্লাসের অন্য ছাত্রদের উদ্দেশে বললেন, তোমাদের কি কিছু জানতে ইচ্ছে করে না? শোভনের মতো তোমরাও আমাকে প্রশ্ন করতে পারো।

শহীদুল স্যার আবার বলতে শুরু করেন, হ্যাঁ, জুলিও কুরি সম্পর্কেও তোমাদের জানা দরকার। আমি এ বিষয়ে তোমাদের বলব। তবে তার আগে তোমরা আমাকে বলো, জুলিও কুরি একজন, না দুজন মানুষ?

পুরো ক্লাস চুপচাপ। কারো মুখে কোনো কথা নেই। সবার চোখে-মুখে যেন অপার বিস্ময়। তবু এর মাঝে টুটুল ঝট করে উঠে দাঁড়ালো। মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলে, স্যার, ওরা দুইজন।

ক্লাসের মধ্যে দুষ্টু ছেলে হিসেবে টুটুল সবার কাছে পরিচিত। স্যার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, এই দুষ্টের শিরোমণি, তুমি কী করে জানলে বলো তো।

টুটুল বুঝে গেল তার উত্তর সঠিক হয়েছে। তবু সে রাখঢাক না রেখে সত্য স্বীকার করল, স্যার, আপনার প্রশ্ন শুনে বুঝেছি। জুলিও কুরি যদি একজন মানুষের নাম হতো, তাহলে আপনি তো এই প্রশ্ন করতেন না।

শহীদুল স্যারের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তার মানে তুমি না জেনে সঠিক উত্তর দিয়েছ। তবুও ভালো, বেশ, একেই বলে বুদ্ধি। বসো, এবার শোনো।

স্যার আবার বলতে শুরু করেন। শোনো তোমরা, জুলিও কুরি আসলে দুজন মানুষ। একজন পুরুষ,

একজন মহিলা। তাঁরা দুজন আবার স্বামী-স্ত্রী। দুজনই ফ্রান্সের মানুষ। জুলিও-র পুরো নাম জঁ ফ্রেডেরিক জুলিও। আর কুরির পুরো নাম ইরেন কুরি। তিনি বিজ্ঞানী পিয়েরে কুরি ও মাদাম কুরির মেয়ে। পিয়েরে কুরি ও মাদাম কুরি দুজনই পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ছিলেন। পিয়েরে কুরি ছিলেন প্যারিসের সর্বন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক। কিন্তু এই পিয়েরে কুরি অল্প বয়সে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর মারি মাদাম প্যারিসের সর্বন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামীর শূন্য পদে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। প্যারিসে তিনি বিখ্যাত রেডিয়াম ইনস্টিটিউট এবং গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে তাঁর গবেষণার প্রধান সহকারী ছিলেন মেয়ে ইরেন কুরি। পরে এই গবেষণাগারে অন্যতম সহকারী হিসেবে যোগ দেন জঁ ফ্রেডেরিক জুলিও।

একসময় জঁ ফ্রেডেরিক জুলিও আর ইরেন কুরি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এরপর থেকে একসঙ্গে তাঁরা জুলিও-কুরি নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

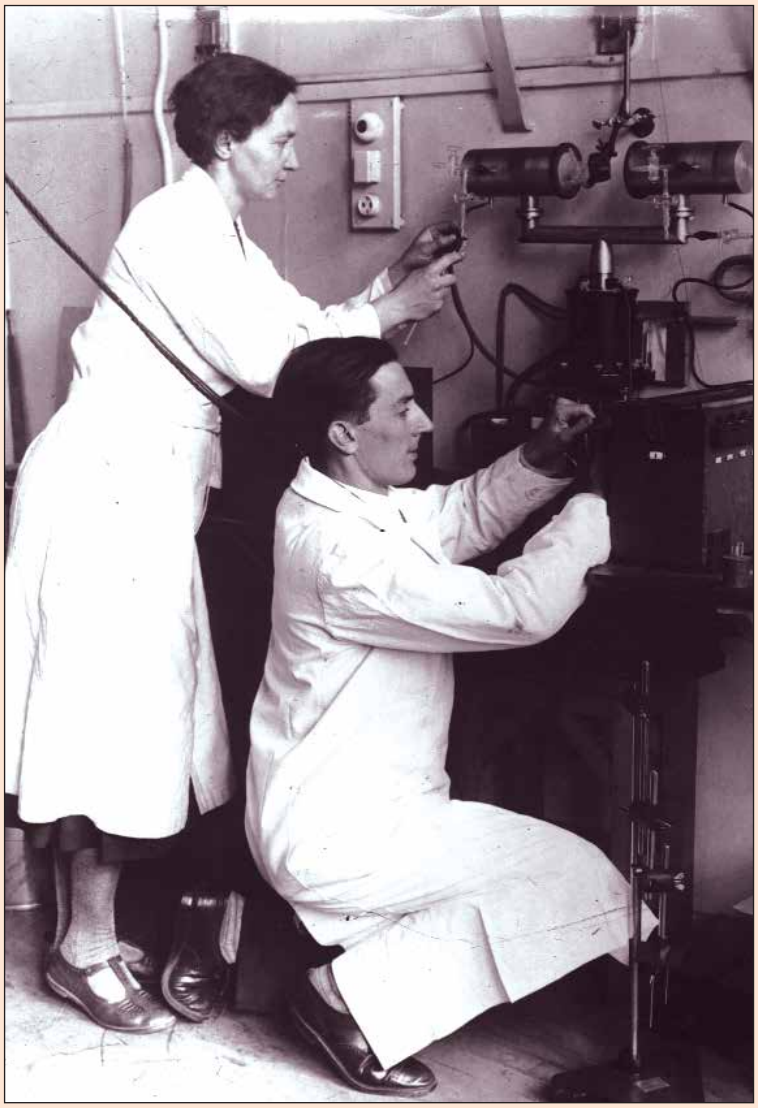

গবেষণাগারে জঁ ফ্রেডেরিক জুলিও কুরি এবং ইরেন কুরি

এইটুকু বলে শহীদুল স্যার একটু থামলেন। ক্লাসে পিনপতন নীরবতা। সবাই শুনছে গভীর মনোযোগে। আজ যেন কৌতূহল বেড়ে গেছে তাদের। পরের কথাগুলো জানার জন্য যেন তর সইছে না। কৌতূহলী ছাত্র নিপুণ দাঁড়িয়ে বলল, স্যার, জুলিও কুরি কেন এত বিখ্যাত হলেন?

–তবে শোনো বাবা, সেই কথাই তো বলছি। জুলিও কুরি এই দুই বিজ্ঞানী ১৯৩৪ সালে বোরন থেকে তেজস্ক্রিয় নাইট্রোজেন আইসোটোপ উৎপাদন করে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় মৌল উৎপাদনের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। এটি ছিল এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী আবিষ্কার। এজন্য তাঁরা দুজন যৌথভাবে ১৯৩৫ সালে রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কারে

ভূষিত হন। এখানেই তাঁদের কীর্তি-অবদান শেষ নয়। ফ্রেডেরিক জুলিও এবং ইরেন কুরি দুজনেই ফ্রান্সের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৫০ সালের পর থেকে উভয়েই কেবল গবেষণা, শিক্ষা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিজেদের উৎসর্গ করেন। তাই পরবর্তীকালে বিশ্বশান্তি পরিষদ এই দুই মহান বিজ্ঞানীর নামে 'জুলিও কুরি শান্তি' পুরস্কার প্রবর্তন করেন।

শোভন কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে আবার উঠে দাঁড়ায়, স্যার, আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোতে বিশ্বশান্তি পরিষদ জুলিও কুরি শান্তি পুরস্কার ঘোষণা তো করলেন, কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে তা প্রদান করলেন কবে?

–ও হ্যাঁ, তাও শোনো। বিশ্বশান্তি পরিষদ এরপর ১৯৭৩ সালের ২২ ও ২৩শে মে ঢাকায় দু-দিনব্যাপী এশিয়ান পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি কনফারেন্স নামে একটি বড়ো সম্মেলনের আয়োজন করে। এই সম্মেলনের শেষ দিন ২৩শে মে বিশ্বশান্তি পরিষদের মহাসচিব রমেশচন্দ্র বঙ্গবন্ধুকে জুলিও কুরি শান্তি পদক পরিয়ে দেন।

ক্লাস ভর্তি ছাত্রদের চোখগুলো অজানাকে জানার আনন্দে ঝলমল করে উঠেছে। এ দৃশ্যটা শহীদুল স্যারের খুব প্রিয়। তিনি এবার খুশি মনে বলেন, তোমাদের আরো জানা দরকার বঙ্গবন্ধুর আগে এবং পরে বিশ্বের আর কোন কোন মহান মনীষী এই সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ভারতের পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, কিউবার ফিদেল ক্যাস্ত্রো, চিলির সালভেদর আলেন্দে, ভিয়েতনামের হো চি মিন, ফিলিস্তিনের ইয়াসির আরাফাত, দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা প্রমুখ।

শহীদুল স্যার একটু দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করেন, তোমরা নিশ্চয়ই এবার বুঝতে পারছ, আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত উঁচু মানের নেতা ছিলেন, কত বড়ো মনের মানুষ ছিলেন। দেশ ও দেশের মানুষকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি এই নজির রেখে গিয়েছেন। বিশ্বে এমন দেশপ্রেমী নেতা আর দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে না।

বলতে বলতে শহীদুল স্যারের গলাটা যেন ভারী হয়ে এল। আবেগে স্যারের চোখের কোণ চিকচিক করে উঠল। বঙ্গবন্ধুর প্রতি স্যারের গৌরবদীপ্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাব-আবেগ ক্লাসের ছাত্রদেরও মন ছুঁয়ে গেল। স্যার ক্লাস শেষে বেরিয়ে গেলেও ছাত্ররা যেন অন্যরকম এক ঘোরের মধ্যে রয়ে গেল অনেকক্ষণ।

বাড়িতে ফিরে এসেও শোভনের বঙ্গবন্ধু ঘোর কাটে না। রাতে খেয়েদেয়ে বিছানায় শুয়ে শোভন রচনা বই খুলে বঙ্গবন্ধু রচনাটি দেখে নিচ্ছে। আগামীকাল বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে বঙ্গবন্ধু বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে সে। প্রতিযোগিতায় একটি ভালো রচনা তাকে লিখতেই হবে।

রাতে হঠাৎ যেন বঙ্গবন্ধুর গলা শুনতে পেল শোভন। বঙ্গবন্ধু বলছেন, শোভন, ওঠো, ওঠো, তোমাকে এত ঘুমালে চলবে? আমার সোনার বাংলা গড়তে হবে না? সোনার বাংলা গড়ার জন্য চাই সোনার ছেলে। তোমরাই আমার সোনার ছেলে। ওঠো, পড়াশোনা করো, মানুষ হও শোভন। বাংলাদেশ তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

বঙ্গবন্ধুর ডাক শুনে ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসল শোভন। রচনা পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝতেই পারেনি সে। ■

---

শিশুসাহিত্যিক ও সাবেক উপপরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি

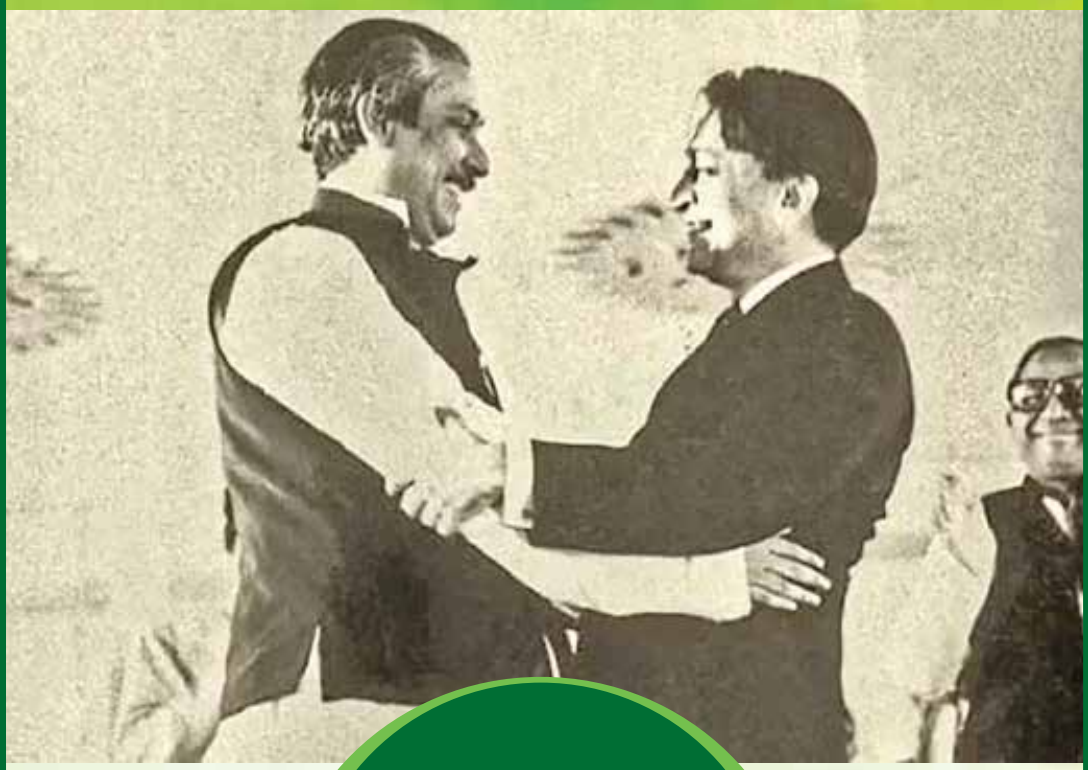

# ‘জুলিও কুরি শান্তি পদক’ প্রাপ্তির ৫০ বছর

দেলওয়ার বিন রশিদ

বাংলার মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদান রাখায় ১৯৭৩ সালের ২৩শে মে বিশ্বশান্তি পরিষদের সর্বোচ্চ সম্মাননা ‘জুলিও কুরি শান্তি পদক’ পান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির মুক্তির দূত। তিনি বাঙালির চিরকালের স্বপ্ন-আশা সংগ্রামের সমন্বয়ক। অধিকারহারা চির বঞ্চিত বাঙালির বুকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার যে স্বপ্ন ও আশা জাগিয়েছিলেন নিজেই তা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করে বাঙালি হৃদয়ে স্থান করে নেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিসত্তা নির্মাণের মহানায়ক।

বাঙালি জাতিকে ইতিহাসের এক মাহেন্দ্রক্ষণে তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব প্রজ্ঞা ও হৃদয়ের ভালোবাসার শক্তিতে একতাবদ্ধ করতে সক্ষম হন। ফলশ্রুতিতে আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে সসম্মানে অবস্থান করছে। বঙ্গবন্ধু, বাঙালি ও বাংলাদেশ একসূত্রে গাঁথা। বাঙালি জাতির স্বপ্ন পূরণে দীর্ঘ ২৩ বছর নানা নির্যাতন, জেল, জুলুম, কারাবাস সহ্য করেছেন তিনি। তাঁর সারা জীবনের ত্যাগ ও কষ্টের অর্জন স্বাধীন বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর স্বর্ণাভ নাম আজ বাঙালি জাতির ইতিহাসে শুধু নয়, সমগ্র জাতির মানসে চির অম্লান ও চির ভাস্বর।

শৈশব থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানুষকে ভালোবাসতেন, মানুষের দুঃখে তিনি ব্যথিত হতেন, মানুষের কষ্ট লাঘবে এগিয়ে যেতেন। শুধু বাঙালি নয়, তিনি বিশ্বের নির্যাতিত-নিপীড়িত-শান্তিকামী মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, বিশ্বের যে-কোনো প্রান্তের অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি কথা বলেছেন, সোচ্চার হয়েছেন। তিনি ছিলেন নিপীড়িত, নির্যাতিত, মেহনতি মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু। তিনি ছিলেন বিশ্বের নির্যাতিত- নিপীড়িত মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা। তিনি আজীবন স্বাধীনতা, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়েছেন, শান্তি ও সাম্যের কথা বলেছেন । সহ্য করেছেন শাসকগোষ্ঠীর নানা নির্যাতন জেল-জুলুম। জীবনের দীর্ঘ সময় তাঁর কেটেছে কারার অন্তরালে।

বঙ্গবন্ধু তাঁর শিক্ষাজীবনেই রাজনীতিতে জড়িয়ে যান, সেই সাথে বিশ্বশান্তির বিষয়টিও তাঁর চিন্তা-চেতনায় স্থান পায়। বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য কারাভোগ করে সবে মুক্তি পেয়েছেন। তখন তাঁর শারীরিক অবস্থা ভালো ছিল না। সে অবস্থায়ই অক্টোবরে চীনে অনুষ্ঠিত 'পিস কনফারেন্স অব দা এশিয়ান অ্যান্ড প্যাসিফিক রিজিওনস' এ যোগ দেন। এই সম্মেলনে শান্তিকামী মানুষের পক্ষে বঙ্গবন্ধু কথা বলেছেন। নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ৩৭টি দেশ হতে আগত শান্তিকামী নেতাদের সাথে মতবিনিময় করেন, নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন। ১৯৫৬ সালে স্টকহোমে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি পরিষদের সম্মেলনেও অংশ নেন। তিনি সম্মেলনে বিশ্বের নির্যাতিত, নিপীড়িত, অধিকারহারা শান্তিকামী মানুষের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে বলেন, 'বিশ্বশান্তি আমার জীবনের মূলনীতি। নিপীড়িত, নির্যাতিত, শোষিত শান্তিকামী সংগ্রামী মানুষকে যে-কোনো স্থানেই হোক না কেন, তাদের সঙ্গে আমি রয়েছি। আমি চাই বিশ্বের সর্বত্র শান্তি বজায় থাকুক, তাকে সুসংহত করা হোক।' বঙ্গবন্ধু বিশ্বশান্তির স্বপক্ষে কাজ করতে গিয়ে বারবার আশাহত হয়েছেন। দেশে

দেশে মানুষকে অধিকারহারা আর নির্যাতিত হতে দেখে বঙ্গবন্ধু ব্যথিত হন । নিজের দেশে পাকিস্তানিদের দ্বারা বাঙালিদের নিষ্ঠুর নির্যাতনে তিনি প্রতিবাদী হয়েছেন, রুখে দাঁড়িয়েছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বিশ্ব পরাশক্তির কতিপয়ের বৈষম্যমূলক আচরণে বঙ্গবন্ধু দুঃখ পেয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'বৃহৎ শক্তিবর্গ বিশেষভাবে আগ্রাসী নীতির অনুসারী কতিপয় মহাশক্তির অস্ত্রসজ্জা তথা অস্ত্র প্রতিযোগিতার ফলে আজ এ সংকট সৃষ্টি হয়েছে।'

বঙ্গবন্ধু বরাবরই যুদ্ধ,বিগ্রহ, অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। যেখানে মানুষের অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তিনি সেখানেই সোচ্চার হয়েছেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন। বিশ্বের পরাশক্তির উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমরা চাই, অস্ত্র প্রতিযোগিতার ব্যয়িত অর্থ দুনিয়ার দুঃখী মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যয় করা হোক, তাহলে পৃথিবী হতে দারিদ্র্যের অভিশাপ মুছে ফেলার কাজ সহজসাধ্য হবে।'

বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন যে, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিশ্বশান্তির অন্তরায়। তিনি তাই সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে জোর দিয়েছিলেন। বিশ্ব রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও তিনি কোনো সামরিক জোটে যোগ দেননি। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, 'আমরা সর্বপ্রকার অস্ত্র প্রতিযোগিতার পরিবর্তে দুনিয়ার সকল শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের কল্যাণে বিশ্বাসী বলেই বিশ্বের সব দেশ ও জাতির বন্ধুত্ব কামনা করি। সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বিদ্বেষ নয় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের এই নীতিতে আমরা আস্থাশীল। তাই সামরিক জোটগুলোর বাইরে থেকে সক্রিয় নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি আমরা অনুসরণ করে চলেছি।'

নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতিতে অটল থাকলেও যখন বঙ্গবন্ধু কোথাও মানবাধিকার লঙ্ঘিত হতে দেখেছেন, তখনই বঙ্গবন্ধু সোচ্চার হয়েছেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, 'পৃথিবী দু'ভাগে বিভক্ত, শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।' বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই নীতিতে অটল ছিলেন। তিনি কোনো কিছুই পরোয়া করেননি। যেখানেই মানবতা বিঘ্নিত হয়েছে, মানুষ অধিকারহারা হয়েছে-তিনি প্রতিবাদে ফেটে পড়েছেন। যা শুধু জাতীয় পর্যায়ে সীমিত ছিল না, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও তাঁর এই বলিষ্ঠতা, মানবিক দৃঢ়তা প্রত্যক্ষ করা যায়।

শত ষড়যন্ত্র, প্রতিকূলতা পেরিয়ে ৩০ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে তাঁরই নেতৃত্বে অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা। বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধুর ত্যাগ ইতিহাসের স্বর্ণাভ অধ্যায়ে শুধু নয়, বাঙালির হৃদয়েও লেখা রয়েছে। তিনি বরাবরই মুক্তিকামী মানুষের পাশে থেকে তাঁদের অভয় দিতে কুণ্ঠিত হননি। যে কারণে ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাউস, মোজাম্বিক, গিনিসহ দুনিয়ার সকল উপনিবেশ বিরোধী সংগ্রামে ছিল বঙ্গবন্ধুর অকুণ্ঠ সমর্থন। বঙ্গবন্ধু বিশ্বশান্তি, নিরস্ত্রীকরণ ও মানব কল্যাণের কর্মপ্রয়াসকে অভিনন্দিত করেছেন, স্বাগত জানিয়েছেন।

জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রাপ্তি ছিল বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের বিশেষ করে নিপীড়িত, নির্যাতিত মানুষের জন্য তাদের কল্যাণে সারা জীবন বঙ্গবন্ধুর ত্যাগ তিতিক্ষারই স্বীকৃতি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রায় পরপরই বঙ্গবন্ধুর এই আন্তর্জাতিক পদক প্রাপ্তিতে বাংলাদেশের মর্যাদা বেড়ে যায়, সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে অন্যান্য রাষ্ট্র, জাতিসংঘসহ বিশ্ব সংস্থার কাছ থেকে স্বীকৃতি ও সদস্য পদ পেতে সহজ হয়।

'জুলিও কুরি' শান্তি পদক একটি সম্মানজনক আন্তর্জাতিক পদক। বিশ্বশান্তি পরিষদ ১৯৫০ সাল থেকে মানবতার কল্যাণে, শান্তির পক্ষে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বরেণ্য ব্যক্তি ও সংগঠনকে এ শান্তি পদক প্রদান করছে। ফরাসি পদার্থবিজ্ঞানী জঁ ফ্রেডেরিক জুলিও কুরি ১৯৫৮ সালে মৃত্যুবরণ করলে বিশ্বশান্তি পরিষদ তাদের শান্তি পদকের নাম ১৯৫৯ সাল থেকে রাখে 'জুলিও কুরি'। ফ্রেডেরিকের স্ত্রী ইরেন কুরি, উভয়েই নোবেল পুরস্কার পান। ইরেনের

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ফিদেল ক্যাস্ত্রো

ইয়াসির আরাফাত

জওহরলাল নেহেরু

হো চি মিন

নেলসন ম্যান্ডেলা

পাবলো নেরুদা

মার্টিন লুথার কিং

জুলিও কুরি পদকপ্রাপ্ত কয়েকজন বরেণ্য ব্যক্তি

বাবা ও মা দুজনও নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী। তাঁরা হলেন মাদাম কুরি ও পিয়েরে কুরি। ১৯৭২ সালের ১০ই অক্টোবর চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোয় বিশ্বশান্তি পরিষদের প্রেসিডেনশিয়াল কমিটির সভায় ১৪০টি দেশের ২০০ জন শান্তি পরিষদ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বাঙালি জাতির মুক্তির আন্দোলনে নেতৃত্ব

ও বিশ্বশান্তির স্বপক্ষে বিশেষ অবদান রাখায় শান্তি পরিষদের মহাসচিব রমেশচন্দ্রের প্রস্তাবনায় 'জুলিও কুরি শান্তি পদক' বঙ্গবন্ধুকে প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

১৯৭৩ সালের ২৩শে মে ঢাকায় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শান্তি পরিষদের প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় বিশ্বশান্তি পরিষদ আয়োজিত অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক কূটনীতিকদের বিশাল সমাবেশে শান্তি পরিষদের তৎকালীন মহাসচিব রমেশচন্দ্র বঙ্গবন্ধুকে 'জুলিও কুরি শান্তি পদক' পরিয়ে দেন। এই সাথে সেই বিশাল সমাবেশে মহাসচিব রমেশচন্দ্র বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শুধু বঙ্গবন্ধু নন, আজ থেকে তিনি বিশ্ববন্ধু শেখ মুজিব। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, এ সম্মান কোনো ব্যক্তি বিশেষের নয়। এ সম্মান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মদানকারী শহিদদের, স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনানিদের। জুলিও কুরি শান্তি পদক সমগ্র বাঙালি জাতির। বঙ্গবন্ধু ছাড়াও এ জুলিও কুরি শান্তি পদক পান জওহরলাল নেহেরু, ফিদেল ক্যাস্ত্রো, ইয়াসির আরাফাত, হো চি মিন, নেলসন ম্যান্ডেলা, পাবলো নেরুদা, মার্টিন লুথার কিংসহ বিশ্বের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ।

> জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রাপ্তি ছিল বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের বিশেষ করে নিপীড়িত, নির্যাতিত মানুষের জন্য তাদের কল্যাণে সারা জীবন বঙ্গবন্ধুর ত্যাগ তিতিক্ষারই স্বীকৃতি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন। বঙ্গবন্ধুর পথ অনুসরণ করে তাঁর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশসহ বিশ্বের শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। মানুষের দারিদ্র্যমুক্তির ব্রত গ্রহণ করেছেন। শোষণহীন সমাজ গঠনের যে স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। এই সময়ে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ, মেট্রোরেল চালুসহ কৃষি উন্নয়ন ও প্রযুক্তিখাতে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। শান্তি প্রতিষ্ঠা গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান। আর্থসামাজিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু কন্যা অসামান্য অবদান রেখেছেন- যা বঙ্গবন্ধুর চিন্তা চেতনারই প্রতিফলন ফলশ্রুতিতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। ২৩শে মে ২০২৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক প্রাপ্তির ৫০ বছর, এই দিনে জাতির পিতার প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা। ■

---

প্রাবন্ধিক ও শিশুসাহিত্যিক

# এক মহানায়কের গল্প

অমিত কুমার কুণ্ডু

হাইস্কুলের ইতিহাস শিক্ষক আবু আহমেদ। ক্লাসে ঢুকেই ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন করলেন, 'আজ কত তারিখ?' সবাই সমস্বরে বলল, 'আজ ২৩শে মে স্যার।'

'আজ একটা বিশেষ দিন। তোমরা কী কেউ বলতে পারবে আজ কেন বিশেষ দিন?' আবু আহমেদ স্যার প্রশ্নটা করে ছাত্রছাত্রীদের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

তারা কোনো উত্তর করছে না দেখে নীরবতা ভেঙে স্যার নিজেই বললেন, '১৯৭৩ সালের এই দিনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হয় 'জুলিও কুরি' পদক। সেই পদক প্রাপ্তির ৫০তম বার্ষিকী আজ।'

স্যারের কথা শুনে ছাত্রছাত্রীরা একে আপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। স্যার সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন, তারা 'জুলিও কুরি' পদকের নাম এই প্রথম শুনল। স্যার সকলের মনোভাব বুঝতে পেরে বললেন, 'ফরাসি পদার্থবিজ্ঞানী জঁ ফ্রেডেরিক

'জোলিও ক্যুরি'-এর নাম অনুসারে এই পদকের নামকরণ করা হয়। বাংলায় এই পদকের নাম 'জুলিও কুরি' বলা হলেও এর ফরাসি উচ্চারণ 'জোলিও ক্যুরি'। জঁ ফ্রেডেরিক জোলিও ক্যুরি ১৯৫৮ সালে মৃত্যুবরণ করলে বিশ্বশান্তি পরিষদ তাদের শান্তি পদকের নাম ১৯৫৯ সাল থেকে রাখে 'জোলিও ক্যুরি'।

কথা শেষ হলে স্যার বললেন, এই 'জোলিও ক্যুরি' নামটির পেছনে একটি চমকপ্রদ কাহিনি রয়েছে। তোমরা কি জানো কী সেই কাহিনি?

ছাত্রছাত্রীদের এটা জানার কথা নয়। তারা সমস্বরে বলল, 'জানি না স্যার।'

স্যার তখন বললেন, 'ফ্রেডেরিকের মূল নাম ছিল জঁ ফ্রেডেরিক জোলিও। ফ্রেডেরিকের স্ত্রী ইরেন ক্যুরি। তিনিও বিজ্ঞানী। বিয়ের পর ফ্রেডেরিক ও ইরেন উভয়ে উভয়ের পদবি গ্রহণ করেন এবং একজনের নাম হয় জঁ ফ্রেডেরিক জোলিও ক্যুরি এবং অন্যজনের নাম ইরেন জোলিও ক্যুরি। এভাবে একে অপরের পদবি নিয়ে এই 'জোলিও ক্যুরি' নামটির সৃষ্টি হয়।'

স্যারের কথা শেষ হলে ছাত্রছাত্রীরা প্রশ্ন করল, 'স্যার, 'জোলিও ক্যুরি' তো ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানী, তবে তাঁর নামে কেন বিশ্বশান্তি পুরস্কারের নাম হলো?'

স্যার বললেন, 'জঁ ফ্রেডেরিক জোলিও ক্যুরি ও ইরেন জোলিও ক্যুরি শুধু স্বামী-স্ত্রীই ছিলেন না। তাঁরা যৌথভাবে নোবেল পুরস্কারও লাভ করেন। এছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্রেডেরিক জোলিও ক্যুরি শুধু বিজ্ঞানী হিসেবেই কাজ করেননি, তিনি গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়ে এবং তাদের জন্য হাতিয়ার তৈরি করেও অবদান রাখেন। তাঁর অবদানের কারণেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিসমাপ্তি সহজতর হয়। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এই যুদ্ধ পরিসমাপ্তি ছিল খুবই জরুরি। তাছাড়া তিনি নিজে বিশ্বশান্তি পরিষদের সভাপতিও ছিলেন। এসব কারণেই বিশ্বশান্তি পরিষদ তাদের শান্তি পদকের নাম 'জোলিও ক্যুরি' রাখেন।

'স্যার বঙ্গবন্ধুকে এই পুরস্কার কেন দেওয়া হয়েছিল?' ছাত্রছাত্রীরা আবু আহমেদ স্যারের কাছে প্রশ্ন করলে স্যার বললেন, 'বঙ্গবন্ধুর সারা জীবনের দর্শন আর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়কত্বের প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুকে 'জুলিও কুরি' পদক প্রদান করা হয়।'

'স্যার পদক প্রাপক হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নাম ঘোষণা হয় কবে?' ছাত্রছাত্রীদের কৌতূহল যেন শেষই হচ্ছে না।

তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আবু আহমেদ স্যার বললেন, 'বিশ্বশান্তি পরিষদের প্রেসিডেন্সিয়াল কমিটির সভায় ১৪০টি দেশের প্রায় ২০০ জন সদস্য উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা সবাই বঙ্গবন্ধুকে এই পদক দেবার বিষয়ে একমত হয়েছিলেন। এই ঐক্যমত্যের কারণে বিশ্বশান্তি পরিষদ ১৯৭২ সালের ১০ই অক্টোবর পদক প্রাপক হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নাম ঘোষণা করে। আর পরের বছর ২৩শে মে এশীয় শান্তি সম্মেলনের এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে সেই পদক আমাদের জাতির পিতাকে পরিয়ে দেন পরিষদের তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল রমেশচন্দ্র। সেই অনুষ্ঠানে রমেশচন্দ্র বলেছিলেন, 'বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলার নন, তিনি বিশ্বের এবং তিনি বিশ্ববন্ধু।'

'স্যার এর আগে কেউ কি এই পদক পেয়েছিলেন?' একজন ছাত্র প্রশ্নটি করে উঠল।

ছাত্রটির প্রশ্নের উত্তরে স্যার বললেন, 'হ্যাঁ পেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু এই পদকপ্রাপ্তির আগে কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ত্রো, ভিয়েতনামের সংগ্রামী নেতা হো চি মিন, চিলির গণ-আন্দোলনের নেতা সালভেদর আলেন্দে, ফিলিস্তিনের জনদরদি নেতা ইয়াসির আরাফাত প্রমুখ এই পদক প্রাপ্ত হয়েছেন। মূলত, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা এবং মানবতার ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, তাঁরা এই পদকে ভূষিত হয়ে আসছিলেন ১৯৫০ সাল থেকে।

'স্যার বিশ্বশান্তিতে আমাদের জাতির পিতার আগ্রহ কবে থেকে?' একজন ছাত্রী প্রশ্নটি করল।

ছাত্রীটির প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আবু আহমেদ স্যার বললেন, 'বিশ্বশান্তিতে আমাদের মহান নেতার আগ্রহ ছাত্রাবস্থা থেকেই। পরে রাজনীতির মাঠে পুরোপুরি নেমে তিনি এদিকে আরো বেশি নজর দেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে তিনি দীর্ঘদিন কারাভোগ করে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। মুক্তি পান ১৯৫২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি। আর সে বছরই অক্টোবরে চীনে অনুষ্ঠিত হয় 'পিস কনফারেন্স অব দ্য এশিয়ান অ্যান্ড প্যাসিফিক রিজিওন্স'। তাতে যোগ দেন শেখ মুজিবুর রহমান। এই সম্মেলনে যোগ দিয়ে তিনি প্রাসঙ্গিকভাবে অন্য ৩৭টি দেশ থেকে আগত শান্তিকামী নেতাদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেছিলেন। ১৯৫৬ সালের ৫-৯ই এপ্রিল স্টকহোমে বিশ্বশান্তি পরিষদের সম্মেলনেও অংশ নেন তিনি। শান্তি প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'বিশ্বশান্তি আমার জীবনের মূলনীতি। নিপীড়িত, নির্যাতিত, শোষিত ও স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানুষ, যে-কোনো স্থানেই হোক না কেন, তাঁদের সঙ্গে আমি রয়েছি। আমরা চাই বিশ্বের সর্বত্র শান্তি বজায় থাকুক, তাকে সুসংহত করা হোক।'

বঙ্গবন্ধুর 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক পাওয়া নিয়ে আলোচনা শেষ হতে না হতেই স্কুলে ছুটির ঘণ্টা বেজে গেল। আবু আহমেদ স্যার বেরিয়ে এলেন ক্লাস থেকে। একে একে ক্লাস থেকে বেরিয়ে এল ছাত্রছাত্রীরাও। ঠিক সেই সময় স্কুল মাঠ দিয়ে একঝাঁক পায়রা উড়ে চলে গেল। যেন শান্তির বারতা দিয়ে গেল তারা। যেমন শান্তির বারতা দিয়ে গিয়েছিলেন আমাদের বঙ্গবন্ধু। আমাদের জাতির পিতা। ■

---

শিশুসাহিত্যিক

# বঙ্গবন্ধু যখন বিশ্ববন্ধু

মিলি হক

২৩শে মে ১৯৭৩ সাল। এই দিনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে 'জুলিও কুরি' পদক তুলে দেওয়া হয়। ২৩শে মে সেই পদক প্রাপ্তির ৫০তম বার্ষিকী। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধুকে করেছিল বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হিসেবে পান শান্তি পদক 'জুলিও কুরি'।

**কী ছিল সেই শান্তি পুরস্কার**

বিখ্যাত ফরাসি পদার্থবিজ্ঞানী জঁ ফ্রেডেরিক জুলিও কুরি ও তাঁর স্ত্রী ইরেন কুরি যৌথভাবে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কার করেন এবং পেয়ে যান রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার।

ফ্রেডেরিক জুলিও কুরি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শুধু বিজ্ঞানী হিসেবে নয়, গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়ে এবং তাদের জন্য হাতিয়ার তৈরি করেও অবদান রাখেন। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিসমাপ্তি সহজতর হয়। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এই যুদ্ধ পরিসমাপ্তি ছিল খুবই জরুরি।

১৯৫৩ সাল থেকে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছিলেন সেই সব বরেণ্য ব্যক্তিরাই এই পদকে ভূষিত হয়ে আসছিলেন। এদের মধ্যে কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ত্রো, ভিয়েতনামের সংগ্রামী নেতা হো চি মিন, চিলির গণ আন্দোলনের নেতা সালভেদর আলেন্দে, ফিলিস্তিনের জনদরদী নেতা ইয়াসির আরাফাত, পাবলো নেরুদা, মার্টিন লুথার কিং প্রমুখ।

১৯৫৮ সালে জুলিও কুরি মৃত্যুবরণ করলে তাঁর সন্মানার্থে বিশ্বশান্তি পরিষদ তাদের প্রবর্তিত শান্তি পদকের নাম পরিবর্তন করে ১৯৫৯ সালে 'জুলিও কুরি' পুরস্কার রাখেন। বিশ্বশান্তি পরিষদের সর্বোচ্চ সম্মাননা স্বর্ণপদক এটি।

**বঙ্গবন্ধুকে জুলিও কুরি পদক দেওয়া হয় কেন এবং কবে**

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ছিল সংগ্রামের। তিনি ছাত্র অবস্থাতেই রাজনীতি সচেতন ছিলেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্যে এসে জড়িয়ে পড়েছিলেন সক্রিয় রাজনীতিতে। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের একজন অতি উৎসাহী কর্মী ছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শাসকগোষ্ঠী বাঙালি বিরোধী তথা গণবিরোধী ভূমিকার কারণে অবস্থান পরিবর্তন করতে দেরি করেননি। তিনি ছিলেন ন্যায়ের পক্ষে জুলুমের বিরুদ্ধে। তাঁর জীবন নিবেদিত ছিল দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর জন্য। নানামুখী তৎরপতায় নিজের জীবনের সুখ-শান্তি হেলায় উপেক্ষা করে বাংলার মানুষের দুঃখ- মোচনের লড়াইয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছিলেন।

১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেই বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা। তাঁর দল আওয়ামী লীগ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। জন রায়ে তাঁরই হওয়ার কথা পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রথম প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর নেতা ইয়াহিয়া খান বাঙালির হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পণ না করে চাপিয়ে দেন এক বর্বর যুদ্ধ।

গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামী নেতা শেখ মুজিবুরকে বাধ্য হয়েই যুদ্ধের মোকাবিলায় ডাক দিতে হয় মুক্তিযুদ্ধের। স্বাধীনতা যুদ্ধের নয় মাস যুদ্ধ করার পর বাঙালি জাতি স্বাধীনতা লাভ করে।

> বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শুধু বঙ্গবন্ধু নন আজ থেকে তিনি বিশ্ববন্ধুও বটে। সেই দিন থেকে বাঙালি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্বীকৃত বিশ্ববন্ধু শেখ মুজিব।



© 2020 Geology.com

শান্তি আন্দোলনের প্রতি শেখ মুজিব আগ্রহী ছিলেন বরাবরই। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে তিনি ছিলেন কারাগারে। মুক্তি লাভের পর ১৯৫২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি 'পিস কনফারেন্স অব দা এশিয়ান অ্যান্ড প্যাসিফিক রিজিওনস' চীনে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে যোগ দেন অক্টোবর মাসে। তিনি ১৯৫৬ সালে স্কটহোমে বিশ্বশান্তি পরিষদ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন, সেখানে তিনি বলেছিলেন, বিশ্বশান্তি আমার জীবনের মূলনীতি। নিপীড়িত, নির্যাতিত, শোষিত ও স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানুষ যে-কোনো স্থানেই হোক না কেন তাদের সঙ্গে আমি রয়েছি। আমরা চাই বিশ্বশান্তি বজায় থাকুক।

১৯৭২ সালে চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোয় বিশ্বশান্তি পরিষদের প্রেসিডেন্সিয়াল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় বাঙালি জাতির মুক্তি আন্দোলন এবং বিশ্বশান্তির স্বপক্ষে বঙ্গবন্ধুর অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ 'জুলিও কুরি 'শান্তি পদক ১৪০টি দেশের মধ্যে প্রায় ২০০ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে পদক প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৭২ সালের ১০ই অক্টোবর বাঙালি জাতির মুক্তি আন্দোলন এবং বিশ্বশান্তির স্বপক্ষে বঙ্গবন্ধুর অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক প্রদানের জন্য শান্তি পরিষদের মহাসচিব রমেশচন্দ্র প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯৭৩ সালের ২৩শে মে এশীয় শান্তি সম্মেলনে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় বিশ্বশান্তি পরিষদ আয়োজিত অনুষ্ঠানে তৎকালীন শান্তি পরিষদের মহাসচিব রমেশচন্দ্র বঙ্গবন্ধুকে 'জুলিও কুরি' পদক প্রদান করেন। মহাসচিব রমেশচন্দ্র বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শুধু বঙ্গবন্ধু নন আজ থেকে তিনি বিশ্ববন্ধুও বটে। সেই দিন থেকে বাঙালি বঙ্গবন্ধু, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্বীকৃত বিশ্ববন্ধু শেখ মুজিব।

১৯৬৯ সালেই তিনি হয়ে ওঠেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ তাঁকে করেছে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা। আর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পান শান্তি পদক 'জুলিও কুরি'। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর 'জুলিও কুরি' শান্তি পুরস্কার প্রাপ্তির দিনে তাঁর প্রতি জানাই প্রতিটি বাঙালির হৃদয় উৎসারিত বিনম্র শ্রদ্ধা। ■

---

প্রাবন্ধিক ও গল্পকার

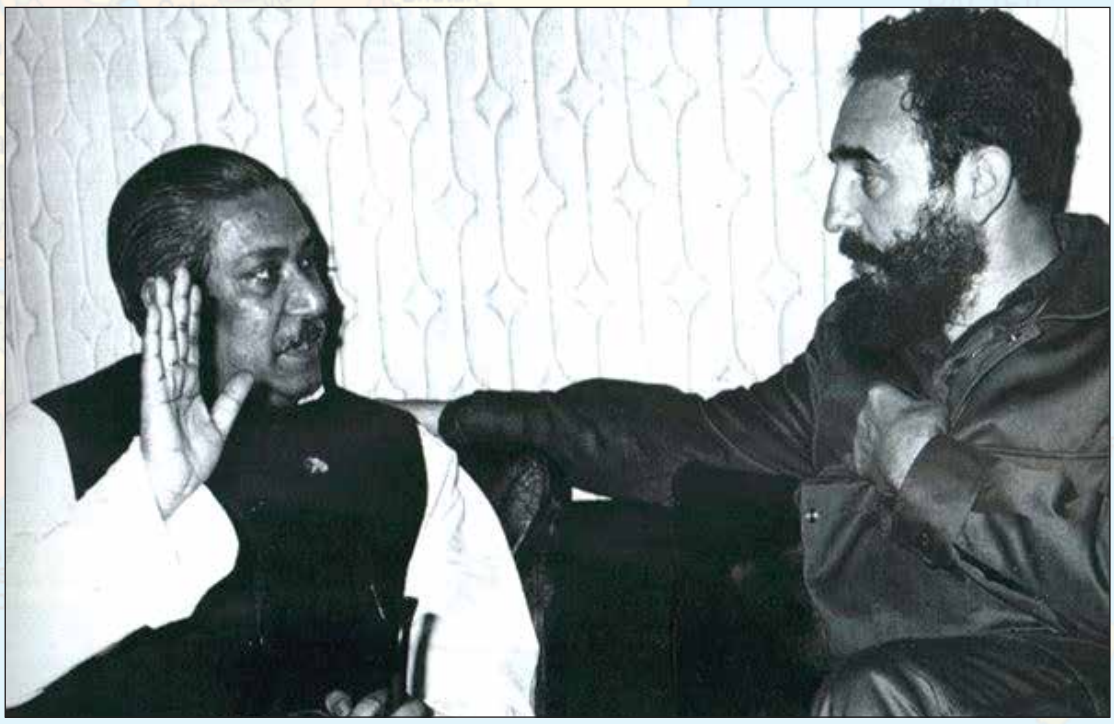

কিউবার প্রধানমন্ত্রী ফিদেল ক্যাস্ত্রোর সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



© 2020 Geology.com

# বন্ধু তিনি বিশ্বের

অবিনাশ আচার্য

শোষণের হাতিয়ারে গড়ে তোলা শোষকের
স্বার্থের ইমারত ভাঙবার লক্ষ্যে
মানুষের কল্যাণে বিশ্বাসী জননেতা
দাঁড়াতেন নিপীড়িত জনতার পক্ষে।

স্বাধীনতা খর্বের সংবাদ পেলে তাই
মানবিক এ নেতার সইতো না তর যে
বিদেশে বা দেশে হোক মানবতা লঙ্ঘিত
প্রতিবাদী ঝড় তোলে উঠতেন গর্জে।

বিদেশের নানামুখী প্রতিকূল বাঁধ ভেঙে
লাখো বীর শহিদের রক্তের সঙ্গে
মার্চের ভাষণেও ঠিক দিক্-নির্দেশে
কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা আসে এই বঙ্গে।

এই নেতা জননেতা পিতা তিনি এ জাতির
বাংলার বন্ধু ও বিশ্বের বন্ধু, সেই সে
ফ্রেডেরিক জুলিও জঁ, ইরেন কুরির নামে
শান্তি পদক পান মে মাসের তেইশে।

এ পদক পেয়েছেন পাবলো ও ক্যাস্ত্রো
আলেন্দে ও ম্যান্ডেলা
মার্টিন ও ইয়াসির আরাফাত,
নেহেরু ও হো চি মিন।

# বঙ্গবন্ধু এবং জুলিও কুরি পদক

চন্দনকৃষ্ণ পাল

একাত্তরে এই বাঙালির মুক্তি আন্দোলন
যাকে নেতা মেনেছিল দেশের জনগণ

বিশ্বশান্তির স্বপক্ষে যাঁর ছিল অবদান
যাঁর প্রেরণায় ত্রিশ লক্ষ মানুষ দিলো প্রাণ-

সেই বাঙালির প্রিয় নেতা প্রাণের মানুষ তিনি
বঙ্গবন্ধু মুজিব নামেই তাঁকে সবাই চিনি।

স্বদেশ এবং বিশ্বশান্তির এই যে বড়ো কাজ
'জুলিও কুরি' নামের একটি পদক নামের তাজ-

তাঁর শিরে রয় শোভিত আর গর্বে ভরে বুক
একটি পদক বিশ্ববাসীর মনে আনে সুখ।

বিশ্বশান্তি পরিষদের পদক এটা জানি
বিশ্বনেতাগণই জানান শান্তির এই বাণী।

উনিশশত তিয়াত্তরের তেইশে মে ঠিক
বিশ্ব এবং এই জাতিকে দেখান তিনি দিক।

বিশ্বশান্তি সম্মেলনে পরেন পদকখানি
মহাসচিব রমেশচন্দ্র রাখেন বিশ্ববাণী-

তিনি শুধু বাংলার নয়, বিশ্ববন্ধু তিনি
প্রাণের মানুষ, জাতির পিতা সবাই তাঁকে চিনি।

# নেতা

তৌফিক আলম তুহিন

অমর অবিস্মরণীয় এক
মহান নেতা তুমি
বঙ্গবন্ধু থেকে হলে বিশ্ববন্ধু
উজ্জ্বল হলো প্রিয় জন্মভূমি।

তোমার নামেই মিশে আছে
বাংলাদেশের নাম
শোধ হবে না কোনোদিন
তোমার আত্মত্যাগের দাম।

একাদশ শ্রেণি, মর্ডান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কুমিল্লা

গল্প

# মায়ের চোখ

ইমরুল ইউসুফ

ভীষণ মন খারাপ টোকনের। স্কুলের বন্ধুরা তাকে প্রতিদিন একই কথা বলে। একই প্রশ্ন করে। প্রশ্নের উত্তর জানতে চায়। কী জবাব দেবে টোকন! সে তো নিজেই জানে না ওই প্রশ্নের উত্তর। স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরে মাকে মাঝেমধ্যেই প্রশ্ন করে। মাও কোনো জবাব দেন না। এজন্য আরও মন খারাপ হয়। অন্তত মা তো জবাব দেবেন। কারণ টোকন মায়ের সঙ্গে থাকে। মা তাকে খুব আদর করেন। ভালোবাসেন। সে যখন যেটা চায় মা তাই দেন। মজার কিছু খেতে চাইলে রান্না করে খাওয়ান। প্রতিদিন বিকেলে স্কুল মাঠে খেলতে দেন। হোমওয়ার্ক শেষ করে একঘণ্টা মোবাইলে গেমস খেলতে দেন। ঘুমানোর সময় গল্প বলে ঘুম পাড়িয়ে দেন। আরও কতো কী যে করেন তার মা। কিন্তু তিনি টোকনের সব প্রশ্নের জবাব দিলেও একটি প্রশ্নের জবাব দেন না। প্রশ্নটি করলেই তিনি অন্য প্রসঙ্গে কথা বলা শুরু করেন। ইনিয়ে-বিনিয়ে সেখান থেকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেন। শুধু একটি কথাই বলেন, সমস্যা আছে বাবা। চোখে আলো লাগলে আমি ভালো দেখতে পাই না। আমার মাথাব্যথা শুরু হয়ে যায়। আর জানোই তো– একবার ব্যথা শুরু হলে সহজে সারতে চায় না। তখন সমস্যা কিন্তু তোমারই হয় বেশি।

টোকনের মায়ের নাম মিনা। শরীফা খাতুন মিনা। শরীফা খাতুন দেশের নামকরা একটি এনজিওতে কাজ করেন। বাবার নাম আজিজুর রহমান। কর্মসূত্রে থাকেন দেশের বাইরে। বাবা বছরে দুবার বাড়িতে আসেন।

এজন্য বাবাকে কাছে পাওয়া যায় না। আর মাকে সারা সপ্তাহের মধ্যে পাওয়া মাত্র একদিন। এজন্য টোকন সপ্তাহের অফিস ছুটির ওই দিনটির অপেক্ষায় থাকে। তাছাড়া মা ওই দিন তাকে স্কুলে নিয়ে যান না। স্কুল গেটে নামিয়ে দিয়ে আসেন না। সারাদিন বাড়িতে থাকেন। বিকাল কিংবা সন্ধ্যার পর বেড়াতে নিয়ে যান। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তার সঙ্গে গল্প করেন। সবচেয়ে বড়ো কথা ওই দিন স্কুলের বন্ধুরা তাকে অসহ্য সেই প্রশ্নটি করে না। মা সম্পর্কে জানতে চেয়ে তাকে অযথা বিরক্ত করে না।

মায়ের মিনা নামটি টোকনের ভীষণ প্রিয়। ছোট্ট একটি নাম। অথচ নামটির মধ্যে অদ্ভুত এক মায়া আছে। রয়েছে অসীম শক্তি আর নিদারুণ সাহসের ছাপ। সেইসঙ্গে বুদ্ধিমত্তা ও সহমর্মিতার এক সুখের রাজ্য। অনেকটা টেলিভিশনে দেখানো কার্টুন চরিত্র 'মিনা'র মতো। মিনা যেমন উপস্থিত বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে সমস্যার তাৎক্ষণিক সামাধান করে। টোকনের মাও ঠিক তেমন। তবে টোকনের একটাই দুঃখ। সেট হলো– আজ পর্যন্ত সে তার মায়ের চোখ ভালোভাবে দেখতে পায়নি। চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারেনি। চোখের দিকে তাকিয়ে কথা না বললে কি মন ভরে? আরাম পাওয়া যায়? মোটেও না। মা কেন যে চোখে সবসময় কালো চশমা পরে থাকেন! যদিও চশমাটি পরলে মাকে খুব স্মার্ট লাগে। নায়িকা নায়িকা লাগে। তারপরও টোকনের ভালো লাগে না। সে তার বাবাকেও অনেক বার এই প্রশ্ন করেছে। বাবাও জবাব দিয়েছেন মায়ের মতো। 'তোমার মায়ের চোখে সমস্যা আছে। বড়ো হও–তখন জানতে পারবে।' এজন্য এ বিষয়ে বাবার কাছে আর কোনো দিন কিছু জানতে চায়নি টোকন। তবে এ বিষয়ে বেশি জানতে আগ্রহী টোকনের স্কুলের বন্ধুরা। তারা বলে, 'তোর মা সবসময় কালো চশমা পরে থাকে কেন রে? কী হয়েছে উনার চোখে?'

এই প্রশ্নটি শুনলেই টোকনের মেজাজ গরম হয়ে যায়। তারপরও মায়ের কথা ভেবে মেজাজ ঠান্ডা রাখে। কারণ মা বলে দিয়েছেন, বন্ধুদের সঙ্গে গণ্ডগোল না করতে। ঠেলাঠেলি, মারামারি না করতে। কোনো বিষয় নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক না করতে। বলেছেন– বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক করবে স্টেজে। বিতর্ক প্রতিযোগিতায়। হাইস্কুলে ওঠার পর। এখন শুধু পড়তে থাকো। ক্লাসের বাইরের বই যত পড়বে ততই বেশি জানবে। আর জানলে তর্ক করা সহজ হয়। বিষয়টি সম্পর্কে সহজে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।

টোকন হাইস্কুলে উঠেছে সেই কবে। এরমধ্যে কতশত বার মায়ের চোখটি দেখার চেষ্টা করেছে। কারণটি বোঝার চেষ্টা করেছে– মা কেন সবসময় চশমা পরে থাকেন। এজন্য সে না ঘুমিয়ে গভীর রাতে মায়ের চোখ দেখার চেষ্টা করেছে। একদিন চশমা ছাড়া মাকে দেখেছে বটে। কিন্তু মা তখন গভীর ঘুমে। চোখের অবয়ব একেবারেই স্বাভাবিক। সুস্থ মানুষের মতো। এজন্য সে কিছু বুঝতে পারেনি। কোনো শব্দ করে মাকে ঘুম থেকে জাগানোর চেষ্টা বা সাহসও করেনি। কারণ টোকন জানে মায়ের এই ঘুমটুকুই রেস্ট। বাকি প্রায় আঠারো ঘণ্টাই মা কোনো না কোনো কাজ করেন।

টিং টং করে ঘরের ডোরবেল বাজলো। দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলল টোকন। বাবাকে দেখে আনন্দে লাফাতে লাগল। জড়িয়ে ধরল। বলল, 'বাবা তুমি এতদিন পরে পরে কেন আসো? তুমি চাকরি নিয়ে দেশে চলে আসতে পারো না? আর কোনোদিন আমাদের ছেড়ে যাবে না।'
'আমার বাবুসোনা কেমন আছো তুমি?'
'ভালো আছি বাবা।'
'আমাকে বাসায় ঢুকতে দেবে না?'
'না দিব না। আগে বলো আমাদের রেখে আর কোথাও যাবে না।'
'আচ্ছা যাব না। এবার তো ঘরে ঢুকতে দাও।'
'মা, মা বাবা এসেছে। শিগগির এসো।'
এই কথা বলে টোকন দৌড় দেয়।
বাবা ফ্রেশ হয়ে লাগেজ নিয়ে বসলেন। টোকনের কাছে এই মুহূর্তটি পৃথিবীর সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্ত। কারণ বাবা লাগেজ থেকে একের পর এক জিনিস বের করতে থাকেন। যেন একটি জাদুর বাক্স। আর বলতে

থাকেন– এটা তোমার। ওটা মায়ের। ওই যে ওটা তোমার চাচ্চুর। ওটা ছোটো ফুপুর ইত্যাদি ইত্যাদি। হঠাৎ লাগেজের ভিতর একটি জিনিসে চোখ আটকে যায় টোকনের। টকটকে লাল রঙের কাগজের ছোট্ট একটি বক্স। চারকোনা ওই বক্সের ওপর একটি চোখ আঁকা। মিশমিশে কালো টানাটানা একটি চোখ। চোখটি এতই সুন্দর যে তাকিয়েই থাকতে ইচ্ছে করে। টোকন ভাবতে থাকে মায়ের চোখটি কি এমন? এমনই সুন্দর তার মায়ের চোখ?

'বাবা, লাল রঙের ওই বক্সটি দেবে? দাও না একটু দেখি ওর ভিতর কী আছে?'

'না বাবা। ওটা তোমার জন্য নয়। ওটা মায়ের কাছেই থাক।'

এই কথা বলে বাবা বক্সটি মায়ের হাতে দিলেন। মা সেটি হাতে রেখে মনোযোগ দিলেন অন্য জিনিসগুলো দেখার প্রতি। বাবার আনা জিনিসগুলো দেখেই কাটল পুরো সন্ধ্যা।

বাবা আসায় টোকন আজ পাশের ঘরে শুয়েছে। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না। আর ঘুম না এলে বারবার বাথরুম চাপে। টোকনেরও তাই হলো। ঘর থেকে বেরিয়ে দেখল মায়ের ঘরে আলো জ্বলছে। জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে কেবল মায়ের হাতটি দেখা যাচ্ছে। হাতে লাল রঙের সেই বক্সটি। সে বাথরুমের কথা ভুলে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বক্সটির দিকে। ভাবে– মা এখন নিশ্চয়ই বক্সটি খুলবেন। আর খুললেই দেখতে পাবে কী আছে ওই বক্সটির ভিতরে। বাবা তখন বক্সটি আমার হাতে দিলে কী হতো! এমনটি যখন ভাবছে ঠিক তখনই বাবাকে যা বলতে শুনল তাতে সে শুধু অবাকই হলো না। রীতিমতো বিস্মিত হলো। তবে তার আসল ঘটনা জানার তখনো বাকি।

বাবা মাকে বলছেন, 'এই চোখটির কিন্তু অনেক দাম। প্রায় বিশ হাজার টাকার মতো। চোখটি পরলে কেউ বুঝতে পারবে না যে ওটি নকল। আগে যেগুলো ব্যবহার করেছ সে চোখগুলো পাথরের মতো স্থির থাকে। এদিক-ওদিক নড়ে না কিংবা ঘুরানো যায় না। কিন্তু এই চোখটি এক্কেবারে কাস্টমাইজড করা আই। মোবাইলে তোমার পাঠানো ছবি দেখে খুবই দক্ষ একজন এই চোখটি বানিয়েছে। চোখটি বের করো। দেখো হুবহু তোমার বাম

চোখের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে বানানো। শিরা, উপশিরা, কর্ণিয়া সব তোমার আসল চোখটির মতো।'

'আসলের মতো। আসল তো আর নয়। তাছাড়া যতই দামি হোক চোখ তো নড়বে না।' মা বললেন।

'এই চোখটি নড়বে। বিভিন্ন দিকেও ঘোরানো যাবে। ফলে আসল-নকলের পার্থক্য চট করে বোঝা যাবে না। মাসে একবার খুলে লোশন দিয়ে চোখটি পরিষ্কার করতে হবে। এটি নিয়মিত পরিষ্কার রাখলে টিকবেও অনেক দিন। আগের চোখটি তো প্রতি সপ্তাহে পরিষ্কার করতে হতো। টানা পরে থাকলে চোখে পানি আসত। পিচুটি হতো। এই চোখটিতে তা হবে না। এখন যাও চোখটি পরে এসো। দেখি তোমাকে কেমন দেখায়।'

মা খাট থেকে উঠতেই জানালার পাশ থেকে সরে গেল টোকন। এভাবে মা-বাবার কথা শোনা ঠিক নয় জেনেও সেখান থেকে সরল না। অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকল। একটু পরেই মা খাটে এসে বসলেন। চোখে চশমা নেই। চশমা ছাড়া এ যেন সম্পূর্ণ অন্য চেহারার এক মা। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে মাকে। স্কুলের বন্ধুদের মায়ের মতো। এই মুহূর্তে মায়ের চোখে কোনো সমস্যা আছে মনে হলো না টোকনের। বাবাকেও একই কথা বলতে শুনল। 'সুন্দর। সত্যিই খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে।' এর কিছুক্ষণ পরেই ঘটল বিস্ময়কর একটি ঘটনা। যেটি দেখার জন্য টোকন মোটেও প্রস্তুত ছিল না।

মায়ের এক চোখ নেই। ডান চোখের জায়গাটি ফাঁকা। এই মুহূর্তে কী যে ভয়ঙ্কর লাগছে মাকে দেখতে। টোকন ভয়ে অস্থির হয়ে উঠল। বুকের মধ্যে ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকল। বার বার মনে হতে লাগল উনিই কি আমার মা? আমার সেই সুন্দর নায়িকা নায়িকা মা? কিন্তু এই মুহূর্তে মায়ের মুখটির মতো অসুন্দর আর কিছুই মনে হচ্ছে না টোকনের। একটি চোখ মানুষের চেহারা এতটাই বদলে দেয়! জানা ছিল না তার। মনে একটাই প্রশ্ন– মায়ের চোখটি নষ্ট হলো কী করে! কী করে ঘটল এমন দুর্ঘটনা! মা কি এজন্যই সারাক্ষণ কালো চশমা পরে থাকেন? চশমার আড়ালে নিজের চোখ দুটিকে সবসময় লুকিয়ে রাখেন?

টোকন সেখানে আর একমুহূর্তও দাঁড়ালো না। বাথরুম সেরে নিজের বেডে শুয়ে পড়ল। এ-কী শুনল সে! এ-কি স্বপ্ন না-কি সত্যি? কী হয়েছিল মায়ের চোখে? কীভাবে হলো এমন করুণ অবস্থা! এমন হাজারো প্রশ্ন টোকনের মনে উঁকি দিতে থাকল। খাটে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করল। কিছুতেই ঘুম এল না।

কথা রাখলেন না বাবা। লাগেজ গুছানো শেষ। চাকরিতে যোগ দিতে কালই রওয়ানা হবেন। বাবা বাড়িতে আসায় এই কদিন দারুণ আনন্দে কাটল টোকনের। তবে মায়ের চোখের বিষয়টি মোটেও ভুলতে পারল না। এক চোখের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারল না। রাতে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে অনেক গল্প হলো। গল্পের এক ফাঁকে টোকন বলল, 'বাবা মায়ের চোখে কী হয়েছিল? বলো না বাবা মায়ের কী হয়েছিল? আজ তোমাকে বলতেই হবে। বলতেই হবে আজ। কেন তুমি আমাকে চোখ আঁকানো বক্সটি সেদিন দেখতে দাওনি? বক্সটির মধ্যে কি চোখ ছিল, মায়ের চোখ?'

বাবা টোকনের প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, 'ঘটনার পুরোটা এখন বলতে পারব না বাবা। বলব আরেক দিন। তুমি যখন আরও বড়ো হবে তখন। আজ শুধু এতটুকু শুনে রাখো– খুব ছোটোবেলায় এক্সিডেন্টে তোমার ডান চোখটি নষ্ট হয়ে যায়। তখন তোমার মা তার একটি চোখ তোমাকে দিয়ে দেন।'

এই কথা শুনে টোকন একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে যায়। কষ্টে বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। নিঃশব্দে হাত রাখে তার ডান চোখে। মায়ের দেওয়া চোখটিও তখন অঝর ধারায় কাঁদছে। ■

---

শিশুসাহিত্যিক ও উপপরিচালক, বাংলা একাডেমি

# মায়ের ভালোবাসা

নুসরাত জাহান

মাগো তোমার ভালোবাসা সবার চেয়ে দামি
তোমার আদর-সোহাগ পেয়ে ধন্য হলাম আমি
ভালোবাসার বাতি জ্বলে তোমার হৃদয় জুড়ে
জন্ম দিয়ে আলো দেখাও এই জগতের পরে।
মাগো তোমার নেই তুলনা তুমিই আমার ছায়া
তোমায় পেয়েই সফল হলো আমার সকল চাওয়া
সকল কাজে তুমি মাগো আমার চোখের মনি
তুমি আমার ভালোবাসা তুমিই আমার খনি।
তোমার কথা মনে হলে বুকটা ফেটে মরে
দিন-রাত্রি দোয়া করি তোমার ভালোর তরে
ভালো থেকো মা তুমি এই আমার চাওয়া
তুমি ভালো থাকলেই মা আমার পরম পাওয়া।

# প্রিয় আপনজন

মো. রিদওয়ানুল ইসলাম

জন্মেছি মা তোমার কোলে
ধন্য হয়েছে জীবন
তুমিই মা এই ভুবনে
সবচেয়ে প্রিয় আপনজন।

দু'নয়নে তোমায় মাগো
দেখি না যে কতদিন
তুমি ছাড়া এই হৃদয়ে
উঠে না  বেজে সুখের বীণ।

কত আদর করে মাগো
মুখে খাবার তুলে দিতে
একটু আঘাত পেলে তুমি
বুকে টেনে নিতে।

অষ্টম শ্রেণি, বাসাবো উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

# মা দিবসের কথা

মেজবাউল হক

মা আমার মা। আমরা মা, আম্মা, মম, মাদার যে নামেই ডাকি না কেন অনুভূতিটা একই। যাঁর সঙ্গে জড়িয়ে আছে নাড়ির টান, জীবনের প্রথম শিক্ষাগুরু, সবচেয়ে বড়ো আপনজন। মা সব শক্তির উৎস। সব ঝড়ঝাপটা থেকে আগলে রাখা ও ভালোবাসার সেই মানুষটির নাম মা। মাকে ভালোবাসতে বা সম্মান জানাতে কোনো একটা দিন দরকার হয় না। জীবনের প্রতিটা দিনই 'মা দিবস'।

বন্ধুরা, মা দিবস হলো পৃথিবীর সকল মায়েদের প্রতি সম্মান জানানোর একটি বিশেষ দিন। কারণ পৃথিবীতে সকল কিছুর মূল্য পরিশোধ করা হলেও মায়ের ভালোবাসা, স্নেহ, মাতৃত্ববোধের কখনো দাম দেওয়া সম্ভব নয়। তাই এই অমূল্য সম্পর্ককে সম্মান জানাতে বিশ্বব্যাপী পালিত হয় বিশ্ব মা দিবস। প্রতি বছর মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার 'বিশ্ব মা দিবস' পালন করা হয়। দিনটি পৃথিবীতে যথাযোগ্য মর্যাদার মধ্য দিয়ে পালিত হয়ে আসছে।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, ভার্জিনিয়ায় অ্যান নামে এক সমাজকর্মী ছিলেন। তিনি নারী অধিকার নিয়ে কাজ করতেন। সেজন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'মাদারস ডে ওয়ার্ক ক্লাব'। ছোটো ছোটো ওয়ার্ক ক্লাব তৈরি করে সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীদের স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করতেন। অ্যান ছিলেন খুবই ধর্মপ্রাণ। অ্যানের একটি মেয়ে ছিল, যার নাম আনা মারিয়া রিভস জার্ভিস। মেয়ের সামনেই অ্যান বলেছিলেন– 'আমি প্রার্থনা করি, একদিন কেউ না কেউ, কোনো মায়েদের জন্য একটা দিন উৎসর্গ করুক। কারণ তারা প্রতিদিন মনুষ্যত্বের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে চলেছেন। এটি তাদের অধিকার। মায়ের সেই প্রার্থনা হৃদয়ে নাড়া দেয় আনার। মায়ের মৃত্যুর পর আনা মেরি জার্ভিস মায়ের শান্তি কামনায় ও তার সম্মানে সরকারিভাবে মা দিবস পালনের জন্য প্রচারণা চালান। তিন বছর পর ১৯০৮ সালের ১০ই মে পশ্চিম ভার্জিনিয়ার আন্দ্রেউজ মেথডিস্ট এপিসকোপাল চার্চে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম মা দিবস পালন হয়।

এরপর ১৯১২ সালে এই দিবসটিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ব্যাপক প্রচার শুরু হয়। এই প্রচার ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ কানাডা, মেক্সিকো, চীন, জাপান, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকায়। প্রচারণার ধারাবাহিকতায় ১৯১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারকে 'মা দিবস' ঘোষণা করেন। এরপর থেকে প্রতিটি দেশে মায়েদের সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানোর জন্য মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার আন্তর্জাতিক মা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। বর্তমানে বিশ্বের ৪০টিরও বেশি দেশে নানা আয়োজনে মা দিবস পালিত হয়ে থাকে। ■

# জাতীয় সংগীতের ইতিবৃত্ত

মোহাম্মদ ইল্‌ইয়াছ

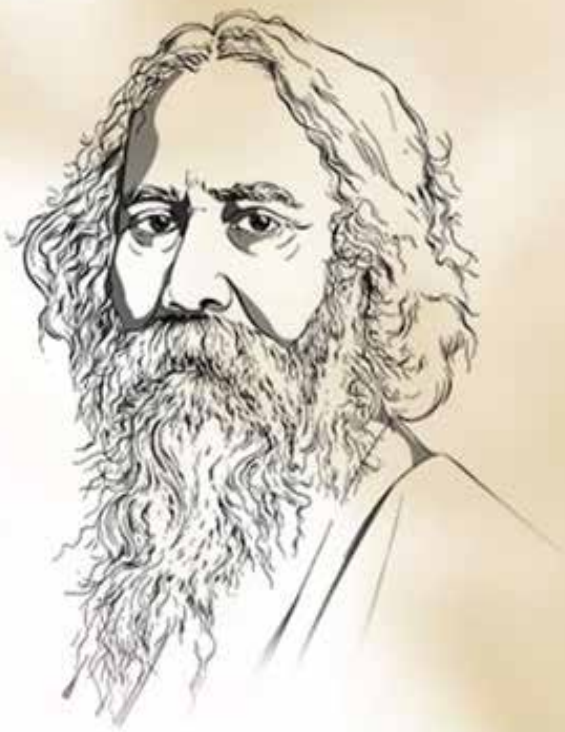

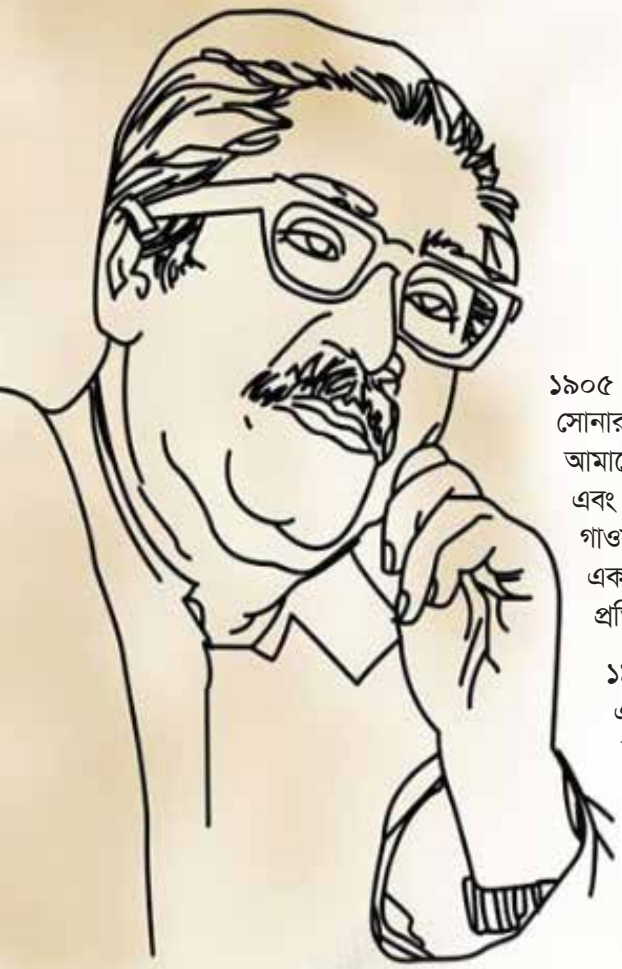

১৯০৫ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আমার সোনার বাংলা' কবিতাটি রচনা করেন। এটি এখন আমাদের জাতীয় সংগীত। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় উপলক্ষ্যে এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় অথবা বাজানো হয়। জাতীয় সংগীত একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও গৌরবের প্রতিফলন।

১৯৫৬ সালে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কয়েকজন নেতা এলেন ঢাকায়। তাঁদের সম্মানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সকলের প্রিয় তরুণ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি সনজীদা খাতুনকে (অধ্যাপক ও সংগীত শিল্পী) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি গাওয়ার অনুরোধ করেন।

স্মরণকালের স্মরণযোগ্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' এই গানটিকে বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেন।

তাছাড়াও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের এই গানটি বাংলাদেশের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে-আন্দোলনে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ও স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্দীপনা জুগিয়েছে। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফার প্রচার-প্রসার যখন আলোড়িত, তখনকার সময়ে আওয়ামী লীগের প্রতিটি অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত 'আমার সোনার বাংলা' গানটি গাওয়া হতো।

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।।
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে, মরি হায়, হায় রে...
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।।
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ কী মায়া গো...
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে-
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা,আমি নয়নজলে ভাসি।।

আহা! কী মধুর মমতামাখা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। ১৯৬৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দীর স্মরণসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন, পূর্ব বাংলার নাম হবে 'বাংলাদেশ' এবং এর জাতীয় সংগীত হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্সের ঐতিহাসিক বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থিতিতে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি সমবেত কণ্ঠে পরিবেশিত হয়েছিল। মুক্তিসংগ্রাম কালের ইতিবৃত্ত শেষ করবার আগে ওপারে জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা' গাওয়া হয়েছিল। প্রথমবার কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কলকাতার বাংলাদেশ হাইকমিশনের সম্মুখবর্তী যে-কোনো জায়গায় বাংলাদেশের এক শিল্পীকে গানটির প্রথমাংশ অর্থাৎ যেটুকু পরে সরকারিভাবে আমাদের বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত সেটুকু গাইতে বলা হয়েছিল, বাংলাদেশ মিশনের পক্ষ থেকে। আর আমাদের দেশে পাকি শত্রুমুক্ত হয়ে গেলে কারো আহ্বানের অপেক্ষা না করেই সকলে মিশনের সামনে জড়ো হয়ে সুরে-বেসুরে প্রাণ খুলে গেয়ে উঠেছিল, 'আমার সোনার বাংলা,আমি তোমায় ভালোবাসি'।

আজ আমাদের স্কুল, কলেজ-মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি-বেসরকারি অফিস-আদালত, রাষ্ট্রীয় সকল অনুষ্ঠানে এবং রেডিও টেলিভিশনসহ সকল ক্ষেত্রে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় এবং বাজানো হয়।

১৯৭২ সালের ১৩ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' কবিতার প্রথম দশ লাইন জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়। এটা বাংলাদেশের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। জাতীয় সংগীতটি যেন সঠিক ও শুদ্ধ সুরে গাওয়া হয় সেজন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি কেবিনেট সভায় নির্দেশ প্রদান করেন। ■

---

শিশুসাহিত্যিক

# নজরুল ও বঙ্গবন্ধু : হৃদকমলের টানে

পীযূষ কুমার ভট্টাচার্য্য

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) ও শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) দুজনের সম্পর্ক শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার। ইতিহাসে অমর দুজন স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তি নজরুল ও বঙ্গবন্ধু। তাঁরা দুজনই বাঙালি জাতির গৌরব। সাহিত্যের কবি নজরুল আর রাজনীতির কবি বঙ্গবন্ধু। দুজনের মধ্যে ছিল এক অমৃত বন্ধন। বঙ্গবন্ধু নজরুলকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। এই লেখার মূল উদ্দেশ্য দুজনের আত্মিক সম্পর্ক তুলে ধরার এক প্রচেষ্টা।

নজরুলকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আগ্রহ ও আমন্ত্রণে ভারত থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের ২৪শে মে সম্পূর্ণ সম্বিতহারা অবস্থায় নিয়ে আসা হয়। তাঁকে নিয়ে আসার পরে জাতির পিতা বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে অভিষিক্ত করেন। নজরুলের সাথে থাকা পুত্রবধূ উমা কাজী ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে রাষ্ট্রীয় অতিথি করেন।[১] উল্লেখ্য, নজরুল বাংলাদেশের জাতীয় কবি হওয়ার পূর্বে ১৫ই ডিসেম্বর ১৯২৯ সালে

কলকাতার এলবার্ট হলে (কলেজ স্ট্রিটে অবস্থিত বর্তমান কফি হাউস) দুপুর দুটোয় মহাসমারোহে সমগ্র বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে 'জাতীয় কবি' রূপে সংবর্ধিত হন। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন কল্লোল ও সওগাত-এর দুই সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ ও মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন। তাঁরা দুজন ছিলেন সংবর্ধনা সমিতির যুগ্ম সম্পাদক। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং সভাপতিত্ব করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।[২]

১৫ই ডিসেম্বর ১৯২৯-এ কলকাতার এলবার্ট হলে নজরুল সংবর্ধনা সভায় সভাপতির ভাষণের উপসংহারে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেছিলেন, ফরাসী বিপ্লবের সময় প্রত্যেক মানুষ অতিমানুষে পরিণত হয়েছিল, আমার বিশ্বাস, নজরুলের কবিতা পাঠে আমাদের ভাবী বংশধরেরা এক একটি অতিমানুষে পরিণত হবে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ভবিষ্যৎ বাণী যে বিফলে যায়নি।

> ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ অপরাহ্নে রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ বাঙালি একটি মানুষের মধ্যে তাদের হাজার বছরের সংগ্রামী ঐতিহ্যের প্রতিফলনে তা উপলব্ধি করতে পেরেছিল। ১৫ই ডিসেম্বর ১৯২৯-এর সংবর্ধনায় নজরুল বলেন 'বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এরি অভিযান সেনাদলের তূর্যবাদকের একজন আমি– এই হোক আমার সবচেয়ে বড়ো পরিচয়। আমি জানি, এই পথ-যাত্রার পাকে পাকে বাঁকে বাঁকে কুটিল ফণা ভুজঙ্গ, প্রখর-দংশন শার্দুল পশুরাজের ভ্রুকুটি! এবং তাদের নখর দংশনের মতো আজো আমার অঙ্গে অঙ্গে। তবু এই আমার পথ, ওই আমার গতি, ওই আমার ধ্রুব। আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি, তাঁর চোখে জলভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্থানের পথে তাঁকে ক্ষুধা-দীর্ণ মূর্তিতে, ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগারের অন্ধকূপে তাঁকে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে দেখেছি।'

বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে বাঙালি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অভিযান সেনাদলের তূর্যবাদকরূপে বাঙালি পেয়েছিল নজরুল আর বঙ্গবন্ধুকে। নজরুলের সেই ভাষণের সাথে তুলনীয় বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণটি। ৭ই মার্চের ভাষণের কিছু অংশ তুলে ধরা হলো :

'আজ দুঃখ-ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন, সবই বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখে বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর এবং রাজশাহী, আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ অধিকার চায়।'[৩]

নজরুল রচিত 'নবযুগ' ৩রা বৈশাখ, ১৩৪৯-এ প্রকাশিত 'বাঙালির বাঙলা' প্রবন্ধে জোর দিয়ে বলেছেন যে বাঙালির জয় হোক, বাংলার জয় হোক। তিনি ছিলেন একজন আপাদমস্তক বাঙালি। তাই তো তিনি বাঙালিকে, বাঙালির সন্তানদেরকে শিশুকাল থেকে আত্মমর্যাদায় বলিয়ান হয়ে গড়ে ওঠার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। প্রাসঙ্গিক উদাহরণ হিসেবে :

এই পবিত্র বাংলাদেশ
বাঙালির – আমাদের।
দিয়া 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়'
তাড়াব আমরা, করি না ভয়
যত পরদেশী দস্যু ডাকাত
'রামা'দের 'গামা'দের।[৪]

বাঙালি অন্তঃপ্রাণ বঙ্গবন্ধু দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি নিবেদিত মানব সেবক হয়ে আরাম-আয়েশ-বিলাস কী জিনিস জানতে পারেননি। মানুষের জন্য, জনগণের জন্য, জাতির জন্য তাঁর কাজ করার আকুলতা খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর দেওয়া বক্তব্যে। তিনি নিজ কণ্ঠেই বলে গেছেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, বাংলার মানুষের মুক্তি চাই।' রাজনীতিতে ত্যাগ ও মানবসেবাই হলো মূল দর্শন।[৫]

নজরুল ও বঙ্গবন্ধু আলোকিত এই দুই বাঙালির মধ্যে বহুবিধ অমৃত সম্পর্কের এক মেলবন্ধন রয়েছে।

সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ :

- জাতীয় কবি নজরুল স্বাধীন বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলার বাস্তব স্রষ্টা।
- নজরুল বিবর্তিত বাঙালির পরিশ্রুত প্রতিকৃতি। বঙ্গবন্ধু বাঙালির পরিপূর্ণ অবয়ব।
- নজরুল তমগুণ বিবর্জিত ও ক্ষাত্রশক্তিতে বলীয়ান বাঙালিত্বের উদ্‌বোধক। বঙ্গবন্ধু সেই ক্ষাত্রশক্তির প্রত্যক্ষ ঘোষক।
- নজরুল বাঙালির বিদ্রোহী আত্মার রূপকার। বঙ্গবন্ধু সেই বিদ্রোহীর প্রত্যক্ষ প্রতিকৃতি।
- নজরুল বাংলার তৃণমূলীয় সমাজ থেকে উত্থিত এক প্রমুখ বাঙালি। বঙ্গবন্ধু একই সমতল থেকে উত্থিত বাঙালির সর্বকালের এক শ্রেষ্ঠ নমুনা।
- উভয়ের সাংস্কৃতিক পাটাতন বাংলার লোকমানস ও লৌকিক আচার-আচরণ।
- উভয়ে বিবর্তনের ধারায় আস্থাবান এবং বৌদ্ধ, হিন্দু, খ্রিষ্টান ও ইসলামসহ বিভিন্ন ধর্মকর্মাশ্রিত ঐতিহ্যের মিথষ্ক্রিয়ায় সৃষ্ট সমন্বয়বাদী এক মিশ্র সংস্কৃতির প্রবক্তা।
- উভয়ে ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী, সমাজতন্ত্রী ও গণতন্ত্রী।
- উভয়ে গণমানুষের শত্রু নিধনের প্রশ্নে অনাপোষী।
- নজরুল চেয়েছিলেন প্রতিটি বাঙালি সৈনিক হোক আর বঙ্গবন্ধু ভীরু বাঙালিকে পরিণত করেছিলেন মরণজয়ী মুক্তিযোদ্ধায়।
- নজরুল মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বের তূর্যবাদক, বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক।
- উভয়ে নারী-পুরুষের সমান অধিকারে বিশ্বাসী।
- নজরুল বাঙালি মুসলমানের মনের শৃঙ্খলছিন্ন করেছেন, বঙ্গবন্ধু ছিঁড়েছেন তাঁর হাতের শৃঙ্খল।
- দুজনেই নির্ভুল বাঙালি। হাজার বছরের ইতিহাসে দুই শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান বাঙালির নাম নজরুল ও বঙ্গবন্ধু।
- দুজনেই প্রাণোচ্ছল, প্রেমোচ্ছল, কিন্তু অভিমানী।
- দুজনই কবি– একজন কবিতার, অন্যজন রাজনীতির।
- দুজনেই চেয়েছিলেন বাংলার জয়।
- নজরুলের 'বাংলার জয়' আর বঙ্গবন্ধুর 'জয় বাংলা' অভিন্ন উৎস থেকে উৎসারিত।[৬]

বঙ্গবন্ধুর আত্মার পরম আত্মীয় ছিলেন নজরুল। তিনি ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে জাতীয় কবির জন্মদিবস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বাণী প্রদান করেন। তার কিছু অংশ তুলে ধরা হলো–

*'শুধু বিদ্রোহ ও সংগ্রামের ক্ষেত্রেই নয়, শান্তি ও প্রেমের নিকুঞ্জেও কবি বাংলার অমৃতকণ্ঠ বুলবুল। দুঃখের বিষয়. বাংলা ভাষার এই বিস্ময়কর প্রতিভার অবদান সম্বন্ধে তেমন কোনো আলোচনাই হলো না। বাংলার নিভৃত অঞ্চলে কবির বিস্মৃত-প্রায় যে-সব অমূল্য রত্ন ছড়িয়ে আছে তার পুনরুদ্ধারের যে-কোনো প্রচেষ্টাই প্রশংসার যোগ্য। মনে রাখতে হবে, বিদ্রোহী কবির এমন এক সময়ে আর্বিভাব, যখন মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের মতো বাংলা সাহিত্য ও কাব্যে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজয়ী প্রতিভা সমস্ত দিক, সমগ্র আকাশ, সমস্ত সাহিত্য-চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করেছিল। কাব্যের অনুভূতির, চেতনার, ছন্দের, সুরের, প্রকাশের, যে পথ দৃষ্টিতে পড়ে, সে পথের মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন মেঘেতে মাথা ঠেকিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু নজরুলের কাব্যের অনন্য সাধারণ স্বাতন্ত্র্য হলো তাঁর কাব্যের স্বকীয়তা আপন মহিমায় ভাস্বর। বৈপ্লবিক কাব্য-জগতে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন স্বতন্ত্র একক একটি সম্পূর্ণ নতুন ব্যক্তিত্ব।'*৭

*বঙ্গবন্ধু খুব সাহিত্যপ্রেমী ছিলেন। নজরুলের আদর্শ, সাহিত্য চর্চা বঙ্গবন্ধুকে সবসময় খুব অনুপ্রাণিত করত। আধুনিক বিশ্বে বঙ্গবন্ধুর মতো একজন ঐতিহ্যমণ্ডিত ব্যক্তিকে নিয়ে অনেক সাহিত্য রচিত হয়েছে। প্রাসঙ্গিক উদাহরণ তুলে ধরা হলো : ১৯৭১ সালে কবি অন্নদাশংকর রায় লিখেছেন–*

'যতকাল রবে
পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে
কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।'৮

*দুই মহাপ্রাণ নজরুল ও বঙ্গবন্ধু চিরকাল নারীকে তাঁদের চিত্তের আলোয় শ্রদ্ধার সাথে দেখেছেন। নরের পাশাপাশি নারীকে সমঅধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁদের হৃদয়ের অভিপ্সা ছিল। তাই বাংলাদেশের নবলব্ধ রাষ্ট্রের সংবিধানে নর-নারীকে সমঅধিকার দেওয়া হয়েছে। নজরুল বীরাঙ্গনার প্রশান্তি গেয়েছেন। আর বঙ্গবন্ধু লাঞ্ছিতা নারীকে সম্বোধন করেন বীরাঙ্গনা রূপে।* তাঁদের দু'জনের অন্তরের এই মিল সকল মানবচিত্ত পাশাপাশি স্থান দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু নজরুল কাব্যের ভাবধারা দ্বারা অনেকাংশে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু এ কারণে স্বধীনতার পর প্রথম সুযোগে নজরুলকে সপরিবারে বাংলাদেশে আনেন এবং পুনর্বাসিত করেন। কোমল চিত্তের বাঙালি নতুন করে নজরুল কাব্যের প্রতি আসক্তি ও নিষ্ঠা প্রকাশ করল। আর তারই ফলস্বরূপ আজ কবি নজরুল ইনস্টিটিউট । আজ এখানে এই দুই মহান আত্মার নদীর মোহনার মতো এক সম্মিলন ঘটেছে।৯

জাতির পিতার শ্রদ্ধার মণি নজরুল। নজরুলকে বঙ্গবন্ধু চিরস্থায়ীভাবে বাংলদেশে নিয়ে এসে অসমান্য মর্যাদা দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর এই অবদান শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। যতদিন পৃথিবী থাকবে। ততদিন নজরুল ও বঙ্গবন্ধু মানব হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন। নজরুল ও বঙ্গবন্ধু হলেন শাশ্বত বাঙালি।■

**তথ্যসূত্র :**


১. উদ্বোধন স্মরণিকা, নজরুল ইন্সটিটিউট কেন্দ্র, কুমিল্লা, ২০ এপ্রিল ২০১৩, পৃ. ৪০
২. মাহবুবুল হক, নজরুল তারিখ অভিধান, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০১০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা. পৃ. ১৫৬
৩. বিদোহী কবি ও বঙ্গবন্ধু, সম্পাদনা, মুহম্মদ নূরুল হুদা, তৃতীয় সংস্করণ, জুন ২০০৯. প্রকাশক, নজরুল ইন্সটিটিউট, পৃ. ৩৪-৩৫
৪. নজরুলের প্রবন্ধ-সমগ্র. সম্পাদনা, মুহম্মদ নূরুল হুদা, রশিদুন্ নবী, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৪, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, পৃ. ২৩০
৫. নবারুণ, প্রধান সম্পাদক, স. ম. গোলাম কিবরিয়া, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা, মার্চ ২০২০, পৃ. ৫৩
৬. বিদোহী কবি ও বঙ্গবন্ধু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯-১০
৭. ঐ, পৃ. ২৬-২৭
৮. সচিত্র বাংলাদেশ, প্রধান সম্পাদক, স. ম. গোলাম কিবরিয়া, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা, নভেম্বর ২০২০, পৃ. ১৩ বিদোহী কবি ও বঙ্গবন্ধু, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮


---


প্রাবন্ধিক ও নজরুল গবেষক

# বঙ্গবন্ধু বিশেষ সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

ফাউন্ডেশন অব সার্ক রাইটার্স অ্যান্ড লিটারেচার (এফওএসডব্লিউএএল) বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর তিনটি বইয়ের জন্য 'বিশেষ সাহিত্য পুরস্কারে' ভূষিত করেছে। বঙ্গবন্ধুর তিনটি বই 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা' ও 'আমার দেখা নয়াচীন' বইয়ের জন্য এ অনন্য সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। ২রা এপ্রিল লেখক ও গবেষক রামেন্দু মজুমদার ও মফিদুল হক গণভবনে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে এ পুরস্কার হস্তান্তর করেন।

২৬শে মার্চ প্রখ্যাত পাঞ্জাবি ঔপন্যাসিক এবং এফওএসডব্লিউএএল-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অজিত কৌর আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠনের আঞ্চলিক সম্মেলনে বাংলাদেশি লেখক ও গবেষক রামেন্দু মজুমদার ও মফিদুল হকের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন। ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে এই অনুষ্ঠান হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে সম্মেলনের উদ্‌বোধনের তাৎপর্য বর্ণনা করে অজিত কৌর এর আগে এক বার্তায় লিখেছিলেন, '১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয় কোনো ছোটো ঘটনা ছিল না।'

এক বার্তায় তিনি বলেন 'বিশ্বজুড়ে মানুষ ভূমি ও অঞ্চলের জন্য, বিদেশি নিপীড়ক বা রাজা ও স্বৈরশাসকদের কাছ থেকে তাদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল ভিন্ন ও অনন্য। কারণ, এটি ছিল 'মানুষের প্রাণবন্ত আত্মা' সংরক্ষণ, যা শুধু তার নিজস্ব সংস্কৃতি এবং নিজস্ব ভাষায় স্পন্দিত এবং বিকাশ লাভ করে!'

বার্তায় তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে না থাকলেও তিনি আমাদের জন্য তিনটি মূল্যবান ও চিন্তাশীল বই রেখে গেছেন। তাই এই মহান মানবের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তাঁকে এফওএসডব্লিউএএল সাহিত্য উৎসব-২০২৩ সম্মাননা দেওয়া হয়।

The Foundation of SAARC Writers and Literature (FOSWAL) একটি অলাভজনক, অরাজনৈতিক সংস্থা, যা ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য হলো দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (সার্ক) লেখক ও সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সহযোগিতা প্রচার করা। এ ফাউন্ডেশনের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো হলো- আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা।

সংগঠনটি বিভিন্ন সাহিত্য অনুষ্ঠান, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করে এবং বই ও জার্নাল প্রকাশ করে। FOSWAL-এর সদর দফতর ভারতের নয়াদিল্লিতে এবং অন্যান্য সার্ক দেশে এর শাখা রয়েছে।

বঙ্গবন্ধুকে পুরস্কারে ভূষিত করার ক্ষেত্রে সংস্থাটি বলেছে– ব্যতিক্রমী সাহিত্য দক্ষতা এবং ট্রিলজিতে তাঁর অসামান্য সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠত্বের জন্য তাঁকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। সংস্থাটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মহাত্মা গান্ধী এবং মার্টিন লুথার কিংয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে এই গ্রহের কোনো শক্তিই তাঁকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে পারবে না। ■

মুক্তিযুদ্ধের ধারাবাহিক কিশোর উপন্যাস

# রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনী

মুস্তাফা মাসুদ

*[পূর্ব প্রকাশিতের পর ত্রয়োদশ পর্ব-প্রথম অংশ]*

**শেষ আঘাত**

সুঁড়োর আস্তানায় আসার পর পুরো একদিন আমরা বিশ্রাম নিলাম। সাইদের হাতে ব্যান্ডেজ করা হয়েছে। এখনো বেশ ব্যথা আছে। ও আমাদের ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল সেন্টারে ডাক্তারের কেয়ারে আছে। এরপর কয়েকদিন কাটল ছোটোখাটো কিছু অপারেশনের পেছনে। ছাতিয়ানতলা বাজারে চাঁদা আদায় করতে আসা কয়েকজন ছিঁচকে বজ্জাত রাজাকারকে শায়েস্তা করতে হলো একদিন। পুকুরিয়ার মোড়ের দোকানদার রমিজ মিয়া একদিন অভিযোগ করল যে, লক্ষ্মীপুরের আবুল মোড়ল তার রাজাকার ছেলের ভয় দেখিয়ে দু'মণ চাল নিয়ে গেছে টাকা না দিয়ে। তাকে ধরে এনে টাকা আদায় করা হলো এবং রমিজ মিয়ার হাতে ধরে তার কাছে মাফ চাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হলো। লক্ষ্মীপুর গ্রামের এক বুড়ির বসতভিটা দখল করে নিয়েছে শান্তি কমিটির এক দালাল কেউকেটা। সেই দালালকে খবর দেওয়া হলো বুড়ির বসতভিটা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। আমার চিঠি পেয়েই সে বুড়ির পায়ে ধরে মাফ চেয়েছে এবং তার বাড়ি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। কড়াইতলার নিরীহ ছাত্র ইসমাইলকে নকশাল অপবাদ দিয়ে রোস্তমপুর থেকে গ্রেফতার করে চাঁড়াভিটা রাজাকার ক্যাম্পে নিয়ে হত্যার নেপথ্য নায়ক মৌলবী লোকমানকে আমরা একরাতে তার বাড়ি থেকে ধরে আনলাম। সে কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না যে, সে রাজাকারদের নাটেরগুরু এবং ছদ্মবেশী রাজাকার। সে পবিত্র কোরান শপথ করে বলল যে, সে নিপাট ভালো মানুষ এবং ইসমাইলকে হত্যার পেছনে তার কোনো হাত নেই। আমি তার কোরান শপথ দেখে হতবাক হয়ে গেলাম– এমন জলজ্যান্ত মিথ্যে সে বলল কীভাবে! কেবল পবিত্র কোরানের সম্মানে আমরা তাকে প্রাণদণ্ড দিলাম না, ক্যাম্পে আটক করে রাখলাম এবং চাক্ষুষ প্রমাণের অভাবে পরে

তাকে ছেড়ে দিতে হলো। অথচ স্বাধীনতার পর কী হলো জানো, দাদুরা?

–স্বাধীনতার পর সে কীভাবে যেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভিড়ে গেল। পূর্বশত্রুতার কারণে দুজন মুক্তিযোদ্ধাকে সে নকশাল বলে ধরিয়ে দিলো রক্ষীবাহিনীর কাছে। গ্রামের মানুষ সবাই একাট্টা হয়ে রক্ষীবাহিনীর দপ্তরে গেলে তবে তারা ছাড়া পায়। কিন্তু তবুও থামে না মৌলবী লোকমান। সে তার ভাড়াটে খুনি দিয়ে গভীর রাতে ওই দুই মুক্তিযোদ্ধাকে খুন করায় খড়েল মাঠের খেজুর বাগানে। সে-ই আবার পরদিন সেই শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের জানাজা পড়ালো!

যাহোক, সামাজিক শৃঙ্খলার স্বার্থে এসব কাজও করতে হচ্ছিল আমাদের। সব মিলিয়ে অবস্থা এমন হলো যে, রতনপুরের এক বিশাল এলাকায় যেন অলিখিতভাবে স্বাধীন বাংলা প্রশাসন কায়েম হয়ে গেল। তাই যুদ্ধ-অপারেশন ছাড়াও এসব ছোটোখাটো কাজ আমরা এড়িয়ে যেতে পারছিলাম না। এরমধ্যে একটি খুশির খবর পেলাম, তা হলো: জমির ভাই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছেন; আতিকও। আতিক গতকাল বাহিনীতে যোগ দিয়েছে।

এক সন্ধ্যায় হঠাৎ আমার ওয়াকিটকি সরব হয়, কথা বলছেন স্বয়ং জমির ভাই। আমি তো খুশিতে আত্মহারা। তবুও যোদ্ধাসুলভ আবেগহীনতা বজায় রেখে তাকে সালাম দিলাম। জমির ভাই নির্দেশ দিলেন– 'অবস্থা খুবই ক্রিটিক্যাল, বাবু। রতনপুর থানা সদর অপারেশনের পর হানাদার আর্মি আর রাজাকাররা ভীষণ ক্ষ্যাপে গেছে। এর আগে তারা স্টিলের বড়ো বড়ো অবকাঠামো দিয়ে দিনের মধ্যেই আয়াপুর ব্রিজ চালু করে ফেলেছে, বলদেঘাটার ব্রিজও। ওদিকে দাইতলার ব্রিজ এখনো অক্ষত থাকায় তাদের যাতায়াত ব্যবস্থা এখন পুরোপুরি নির্বিঘ্ন। এখন তারা পুরো রতনপুর ও তার আশপাশের এলাকায় গণহত্যা চালাবে বলে খবর আছে। আর্মিদের প্রতিরোধের জন্য তাই এখন আশু প্রয়োজন দাইতলার ব্রিজ উড়িয়ে দেওয়া– রওশন ভাইয়েরা কয়েকবার চেষ্টা করেও ব্রিজটি ধ্বংস করতে পারেননি। ব্রিজটি আমাদের যুদ্ধ এলাকার বাইরে– কোতয়ালি থানা এলাকায় হলেও আমাদের এলাকার প্রবেশমুখ হিসেবে আমাদের কাছে এর গুরুত্ব অপরিসীম। তাই রতনপুরে আসার আগেই, দাইতলার ব্রিজের মুখে ওদের আটকাতে হবে। আমি ওই এলাকার কমান্ডার রওশন ভাইয়ের সাথে আলোচনা করেছি, তিনিও তোমাদের সাহায্য চেয়েছেন। আমি চাই– তোমরা দু'গ্রুপ মিলে দাইতলা ব্রিজ উড়িয়ে দাও এবং সেখানেই হানাদারদের খতম করো। এই ব্রিজটি উড়িয়ে দিতে পারলে হানাদারদের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক বহুলাংশে তছনছ হয়ে যাবে। ফলে আমাদের জন্য তা হবে অনেক সহায়ক। ঠিক আছে, বাবু। সব ব্যবস্থা করো। তোমাদের জয় হোক। জয় বাংলা!

আমি ওয়াকিটকির সুইচ অফ করতে-না-করতেই দেখি শুকদেবপুরে অবস্থানরত রওশন বাহিনীর প্রধান গুপ্তচর সুমন আসছে। সে এসেই আমার হাতে ওদের কমান্ডার রওশন ভাইয়ের একটি চিঠি দিলো। আমি তাড়াতাড়ি কাগজের ভাঁজ খুলে চিঠিতে চোখ রাখি। খুব সংক্ষিপ্ত চিঠি, তাতে লেখা: 'প্রিয় বাবু, তোমার বাহিনী নিয়ে সন্ধ্যার পর তারাগঞ্জের উলটো দিকের বড়ো আমবাগানে উপস্থিত হবে। আমিও আমার বাহিনী নিয়ে সেখানে আসব। দুজনে আলোচনা করে দাইতলার ব্রিজ অপারেশনের সব প্ল্যান ঠিক করব। সুমন তোমাদের সাথে থাকবে, তোমাদের পথ দেখিয়ে আনবে।
–ইতি
তোমাদের রওশন ভাই।'

বুঝলে দাদুরা, মুক্তিযুদ্ধের নয়মাসে আমি অনেক অপারেশনে অংশ নিয়েছি। তারমধ্যে দাইতলার ব্রিজ অপারেশনের কথা আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। আরেক গ্রুপের কমান্ডার রওশন ভাই, তিনি বয়সে আমার সিনিয়র হলেও এ যুদ্ধটা আমার কমান্ডেই হয়েছিল, মানে আমিই ছিলাম এ যুদ্ধের কমান্ডার– রওশন ভাইয়ের প্রস্তাব মতোই আমি এ দায়িত্ব নিয়েছিলাম এবং এ যুদ্ধে জিতেছিলাম আমরাই। তবে আমাদেরও বেশ বড়ো ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, সে বিষয় পরে বলছি।

আমার কমান্ডে পঞ্চাশ জন মুক্তিযোদ্ধার একটা দল– রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনীর বিশজন আর রওশন বাহিনীর ত্রিশজন। এদের মধ্যে কেবল রওশন ভাই আমার একটু সিনিয়র। কেউ কেউ আমার সমবয়সি, তবে বেশিরভাগই জুনিয়র। অনেকক্ষণ আলোচনা করে ঠিক করা হলো: এ অপারেশনে ত্রিমুখী অ্যাকশন নেওয়া হবে–

ডিনামাইট, গ্রেনেড আর রাইফেল-এলএমজি-এসএমজি। আমি সবাইকে বললাম, যেমন করেই হোক পাকি হানাদার আর্মিদের ঠেকাতেই হবে। কিছুতেই ওদের দাইতলার ব্রিজ পার হতে দেওয়া যাবে না। তারপর সবাইকে ওয়াদা করালাম– জীবন গেলেও কেউ পিছু হটব না। শত্রুর বুলেট-কামানের সামনে বুক পেতে দেবো, তবুও ভয় পাবো না। পিছু ফিরব না।

রাতের অন্ধকারে বনজঙ্গলের মধ্য দিয়ে খুব সাবধানে আমরা দাইতলার ব্রিজ বরাবর এগিয়ে যাচ্ছি। আমার মাথায় শুধু একটাই চিন্তা– কীভাবে পাকিবাহিনীর অত বড়ো দলটাকে আমরা ঠেকাবো। ডিনামাইট চার্জ করে সহজেই ব্রিজ উড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু ব্রিজ তো রাজাকার আর পাকিস্তানি আর্মিরা পাহারা দিচ্ছে। ওখানে একটা পিঁপড়েরও ঢোকার উপায় নেই। ব্রিজের দুইপাশে হাই-পাওয়ারের বিজলি বাতি জ্বলছে। এরমধ্যে ডিনামাইট ফিট করব কীভাবে! ব্রিজটি এমন সুরক্ষিত হওয়ার কারণেই রওশন ভাইয়েরা এর আগে কয়েকবার চেষ্টা করেও ব্রিজের সামান্য ক্ষতিও করতে পারেননি।

তাছাড়া সামনাসামনি যুদ্ধ করতে গেলেও বিপদ। ওদের সৈন্যসংখ্যা অনেক। দাইতলা মোড়ে ক্যাম্প করে আছে, ব্রিজ পাহারা দিচ্ছে। ওদের সাথে আছে ভারী অস্ত্রপাতি। আর আমাদের কাছে তো অত ভারী অস্ত্র নেই– থ্রি নট থ্রি রাইফেল আর কয়েকটা এল এম জি, কিছু হ্যান্ড গ্রেনেড আর কিছু ডিনামাইট। তাছাড়া আমরা সংখ্যায়ও অনেক কম– দু গ্রুপ মিলে মাত্র পঞ্চাশজন। কী করা যায়, কিছুই ভেবে পাচ্ছিনে। এদিকে দাইতলায় পৌঁছাতে আর বেশি দেরি নেই, বড়োজোর সিকি মাইল পথ সামনে।

হঠাৎ আমি সবাইকে থামার সিগন্যাল দিলাম। এ জায়গাটা একটা ঘন বাবলা বন– অনেকটা জায়গা জুড়ে খালি ঝোপানো বাবলা গাছ। চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। এখানে আমরা থামলাম। আবার আলোচনায় বসলাম। পর্যালোচনায় দেখা গেল, সামনাসামনি যুদ্ধে কিছুতেই পারা যাবে না। হামলা করতে হবে গেরিলা কায়দায়। কিন্তু সবার আগে দরকার ডিনামাইট দিয়ে ব্রিজ উড়িয়ে দেওয়া। তা না হলে কোনো তন্তর-মন্তরেই কাজ হবে না– রওশন ভাইসহ অন্যরা সবাই এই মত দিল।

আমি কিছুক্ষণ ঝিম মেরে থাকলাম। তারপর বললাম– তোমরা ঠিকই বলেছ। প্রথমেই ডিনামাইট মেরে ব্রিজ উড়িয়ে দিতে হবে। তারপর অন্য ব্যবস্থা। তাহলে সবাই চলো, রওনা দিই। জয় বাংলা!

আমার কথার পরও কয়েকজন আমতা-আমতা করতে লাগল। কী যেন বলতে চায় ওরা। আমি একটু বিরক্ত হয়ে বললাম– কী গুজুরগুজুর করছ তোমরা? আমি

> আমি ওয়াকিটকির সুইচ অফ করতে না করতেই দেখি শুকদেবপুরে অবস্থানরত রওশন বাহিনীর প্রধান গুপ্তচর সুমন আসছে।

কমান্ডার। যা বললাম, সেইমতো কাজ করো। এখনই চলো সবাই। এ সময় সাহসী তরুণ মুক্তিযোদ্ধা কদম আলি এগিয়ে এসে বলে– কমান্ডার স্যার, আপনার কথাই মানব আমরা। তবে একটা কথা– ডিনামাইট ফিট করবে কে? পাক আর্মি আর রাজাকাররা শকুনের মতো তাকিয়ে থাকে সবসময়। এরমধ্যে ব্রিজের নিচে গিয়ে কে ডিনামাইট ফিট করবে, এটাই ভাবছি...

আমি বাঘের মতো গর্জন করে উঠলাম কদম আলির কথা

শুনে। বললাম– কমান্ডার আমি না তুমি? শোনো সবাই, ব্রিজের নিচে ডিনামাইট ফিট করব এই আমি– কমান্ডার সোহানুর রহমান বাবু। কীভাবে করব তা পরে দেখা যাবে। তোমরা কোনো চিন্তা করবা না। যে-কোনো বিপদে সাহস হারাবা না। এখন চলো সবাই।

আমরা যখন দাইতলার ব্রিজের কাছাকাছি পৌঁছুলাম, তখন রাত প্রায় চারটা। ব্রিজের আনুমানিক দুইশ গজ পুবে নিরাপদ জায়গায় সবাইকে পজিশন নিতে বললাম। সবাই রাস্তার ঢালে ঝোপঝাড়ের মধ্যে পজিশন নিল। হাড়কাঁপানো শীত। তারপর কুয়াশাও পড়েছে বেজায়। কিন্তু তাতে কী! আমাদের সবার একটাই চিন্তা, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ব্রিজ উড়িয়ে দিতে হবে। তা হলেই হানাদার বাহিনীকে ঠেকানো সম্ভব। এসব চিন্তায় শীত কোথায় পালালো তার ঠিক থাকল না!

আমরা এতক্ষণ চুপ করে দাদুর কথা শুনছি। এবার আর ধৈর্য রাখতে পারি না। বলি– আহ্ দাদু! শীত-ফিতের কথা রাখো তো। আসল কথা বলো। আমার আর তর সইছে না।

দাদু হেসে বলেন– সেই কথাই তো বলছি, দাদুভাইয়েরা। একটু আশপাশ গুছিয়ে বলতে হয় না? তারপর কী হলো শোনো– আমি সবাইকে বলে দিলাম, ডিনামাইট না ফাটা পর্যন্ত সবাই চুপচাপ থাকবা। ডিনামাইট যখন ব্রিজটাকে উড়িয়ে নদীর মধ্যে ফেলে দেবে, তখনই তোমরা ফায়ার শুরু করবা। সবাইকে সাবধানে থাকতে বলে আমি অন্ধকারে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

আমার হাতে একটা পলিথিন ব্যাগ। তাতে তিনটে ডিনামাইট, অনেকখানি তার আর একটা দেশলাই। ব্যাগের মুখ টাইট করে বেঁধে নিলাম। তারপর বেশ খানিকটা দূর দিয়ে ঘুরে হেঁটে চলে গেলাম নদীর পাড়ে। ব্রিজ থেকে অনুমান তিনশ গজ উত্তর দিকে হবে জায়গাটা। এখানে ছিল একটা বড়ো তেঁতুলগাছ। তার ছায়া পড়েছে নদীর মধ্যে। সেই ছায়া বেশ অনেকখানি জায়গা অন্ধকার করে রেখেছে। এই অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পাচ্ছি, বেশকিছু কচুরিপানার ঝাঁক পানিতে ভেসে চলে যাচ্ছে ভাটিতে– দক্ষিণ দিকে। সাথে সাথে আমার মাথায় বুদ্ধি এসে গেল, এই তো সুযোগ– গাছের ছায়ার এই অন্ধকারে পানিতে নেমে যাব। তারপর কচুরিপানার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে ভাসতে ভাসতে চলে যাব ব্রিজের নিচে।

যে ভাবা সেই কাজ। পলিথিন ব্যাগটার মুখ আবারো দেখে নিলাম ভালোভাবে টাইট আছে কিনা। তারপর আস্তে আস্তে নেমে গেলাম পানিতে। অন্ধকারে সাঁতার কেটে মিশে গেলাম কচুরিপানার জঙ্গলের মধ্যে। বরফের মতো ঠান্ডা পানি। দাদুভাইয়েরা, কী বলব তোমাদের! কথায় আছে না, মাঘের জাড়ে বাঘ কাঁপে? সেইরকম অবস্থা। ঠান্ডায় সারা শরীর জমে যাওয়ার মতো হচ্ছে। তবু মন শক্ত রাখলাম।

ব্রিজের দুইপাশে যে খানসেনা আর রাজাকাররা পাহারায় ছিল, তাদের আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ওরা শীতে একেবারে কুঁজো হয়ে যাচ্ছে। ওরা হয়ত ভাবতেও পারছে না এই হাড়কাঁপানো শীতের রাতে কেউ পানির মধ্যে নামতে পারে। তাই ওদের চোখ শুধু নদীর পাড় বরাবর ঘুরপাক খাচ্ছে। পানির দিকে একেবারে তাকাচ্ছেই না আহাম্মক ব্যাটারা।

মিনিট দশেকের মধ্যেই আমি ব্রিজের নিচে চলে এলাম। তারপর সাবধানে কচুরিপানার আড়াল ছেড়ে ব্রিজের গোড়ায় চলে গেলাম। তাড়াতাড়ি পলিথিন ব্যাগের মুখ খুলে ডিনামাইটগুলো বের করলাম। তারের কানেকশন লাগিয়ে জুতমতো তিন জায়গায় তিনটা ডিনামাইট ফিট করলাম। এরপর তারের একমাথা উঁচু করে হাতে ধরে আবার ভেসে যাওয়া একঝাঁক কচুরিপানার আড়ালে লুকিয়ে দক্ষিণ দিকে খানিকটা ভাটিতে এগিয়ে গেলাম। আর কী অবাক কাণ্ড! এখানেও নদীর পাড় বরাবর একটা বড়ো তেঁতুলগাছ। বিশাল ছায়া বিছিয়ে রেখেছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে। আর সেই ছায়ার নিচে হামলে পড়েছে একরাশ সুহৃদ অন্ধকার। ঘন অন্ধকার যে মানুষের এত বড়ো বন্ধু হতে পারে তা এই প্রথম বুঝলাম। তেঁতুলগাছের আশপাশ ঘিরে বেশ বড়ো ঘন ঝোপঝাড়। আমি এই ছায়ার অন্ধকারের আড়ালে থেমে গেলাম। তারপর আস্তে আস্তে কিনারে গিয়ে ঝোপের মধ্যে বসে থাকলাম কখন আর্মির গাড়ি আসে সেই আশায়। বুঝলে দাদুরা, সেই কড়া শীতও আমাকে কাবু করেতে পারছে না। আমি রীতিমতো শক্ত হয়ে বসে আছি ব্রিজের দিকে তাকিয়ে। ■ *[চলবে...]*

শিশুসাহিত্যিক

# ফিরে এল তালপাতার পুঁথি

তাসীন মাহমুদ

হাজার বছর আগের ঐতিহ্য ফিরিয়ে এনেছে বাংলাদেশের লেখক চয়ন খায়রুল হাবিব ও শিল্পী আফরোজা জামিল কংকা। তাদের প্রচেষ্টায় রচিত হলো তালপাতায় 'বাঙালির পরিচয় কাব্য'। এতে বঙ্গবন্ধুর জীবন কাব্য রচিত হয়েছে। এই তালপাতার পুঁথিটিতে বাঙালির সব ভাগ আছে। আমাদের দেশে বহু পুরনো, হাজার বছরের তালপাতার পুঁথি সংরক্ষিত আছে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কাছে অতি অনুসরণীয় ও সম্মানিত এ গ্রন্থ। একাদশ ও দ্বাদশ শতকে লেখা *'অষ্টসাহস্রিকা' 'প্রজ্ঞাপারমিতা'* নামের দুটি পুঁথি রাজশাহীর বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। ইতিহাসবিদ গৌতম ভদ্র রাজশাহী সফরে এসে এই পুঁথি দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। এবার পুরোপুরি আমাদের নিজেদের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় তৈরি হলো এ সময়ের পুঁথি 'বাঙালির পরিচয় কাব্য।' এই পুঁথির টেক্সট রচয়িতা চয়ন, 'বাঙালির পরিচয় কাব্য' নামে আখ্যানধর্মী দীর্ঘ কবিতা লিখে শেষ করেন ২০২০ সালে। কবিতাটির পরতে পরতে বাংলাদেশের ইতিহাস, বাঙালি জনগোষ্ঠীর বিবর্তন এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনের প্রতীকী আখ্যান তুলে ধরা হয়েছে। বাংলা পুঁথিসাহিত্য নিয়ে চয়নের আগ্রহ অনেক দিনের। তাই কবিতাটিকে তালপাতায় অলংকরণসহ সংরক্ষণের প্রণোদনা কাজ করছিল তার। কিন্তু বাংলাদেশে তালপাতার পাখা থাকলেও, তালপাতার পুঁথি লিখবার দক্ষতাসম্পন্ন আলংকারিক নেই। এটা নিয়ে চয়ন বিভিন্ন জনের সঙ্গে কথা বলেন, যাতে এখান থেকে একটা লুপ্ত শিল্প

পুনরুদ্ধার বা প্রকল্পের সূত্রপাত ঘটানো যায়। তারপর কাজটা কীভাবে শুরু করবেন এ নিয়ে শিল্পী আফরোজা জামিল কংকার সাথে কথা বলেন। (শিল্পী আফরোজা জামিল কংকার বাবা শহীদ কর্নেল জামিল আহমেদ ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হন।) 'চয়ন কাব্যটি নিয়ে পরিকল্পনার কথা জানালো। কাব্যটার ওপর ভিত্তি করে চিত্রাঙ্কনের প্রস্তাব দিলো এবং বলল সেটা তালপাতার পুঁথি আকারে করতে হবে। কংকা প্রথমে সাহস করতে পারেনি। কিন্তু পরে রাজি হয়। কাব্যটি বেশ কঠিন আকারে লেখা। চয়ন ফ্রান্স থেকে ফোনে ব্যাখ্যা করছিল আর কংকা স্কেচ করে যাচ্ছিল। এরপর মাথা খুলে গেল। আবেগে আপ্লুত হয়ে বঙ্গবন্ধুর পুরো সংগ্রামী জীবনটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো কংকার।

পদ্ধতিটি মোটেই সহজ ছিল না। তালপাতার ওপর ছবি এঁকে এবং লিখে সেটাকে খোদাই বা এচিং করতে হয়, তারপর বিশেষ কালি দিয়ে সেগুলোকে মুছে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হয়। কংকার এর ওপর কোনো দক্ষতাই ছিল না। এই কাজে দক্ষ ওরিশার শিল্পী প্রশান্ত মহারানা। প্রশান্তর সাত প্রজন্ম তালপাতা চিত্রশিল্পী। প্রথমে প্রশান্ত মহারানার কাছে গিয়ে কাজটি শিখার কথা ভাবলেও পরে নানা চ্যালেঞ্জের মুখে প্রশান্তকেই ঢাকাতে নিয়ে আসতে হয়। কংকা লেখা এবং চিত্রকর্ম তালপাতার ওপর করল আর সেগুলো খোদাই করল প্রশান্ত। তৈরি হলো এক নতুন ইতিহাস। তালপাতার পুঁথি বাংলাদেশে এখন লুপ্ত শিল্প। 'বাঙালির পরিচয় কাব্য'কে তালপাতার পুঁথিতে রূপান্তরের সুবাদে কংকা এখন এ শিল্পে একজন পারঙ্গম শিল্পী। পরের প্রজন্মের কাছে এটাকে ছড়িয়ে দিতে চায় কংকা আর চয়ন। তালপাতার পুঁথি একটা শ্রমসাধ্য, সময়সাপেক্ষ কারুকলা। এটাকে লোকজ শিল্পের অন্যান্য বিপণনের মধ্যে আনা যায় কিনা, তা নিয়ে দুজনের পরিকল্পনা আছে।' দুষ্প্রাপ্য এই ঐতিহ্য ফিরিয়ে এনে ইতিহাসের বয়ান তুলে ধরা খায়রুল হাবিব চয়ন রচিত 'বাঙালির পরিচয় কাব্য' নামের তালপাতার পুঁথিটির প্রথম কপিটি বঙ্গবন্ধু জাদুঘরকে উপহার দেয়া হবে। ■

প্রাবন্ধিক

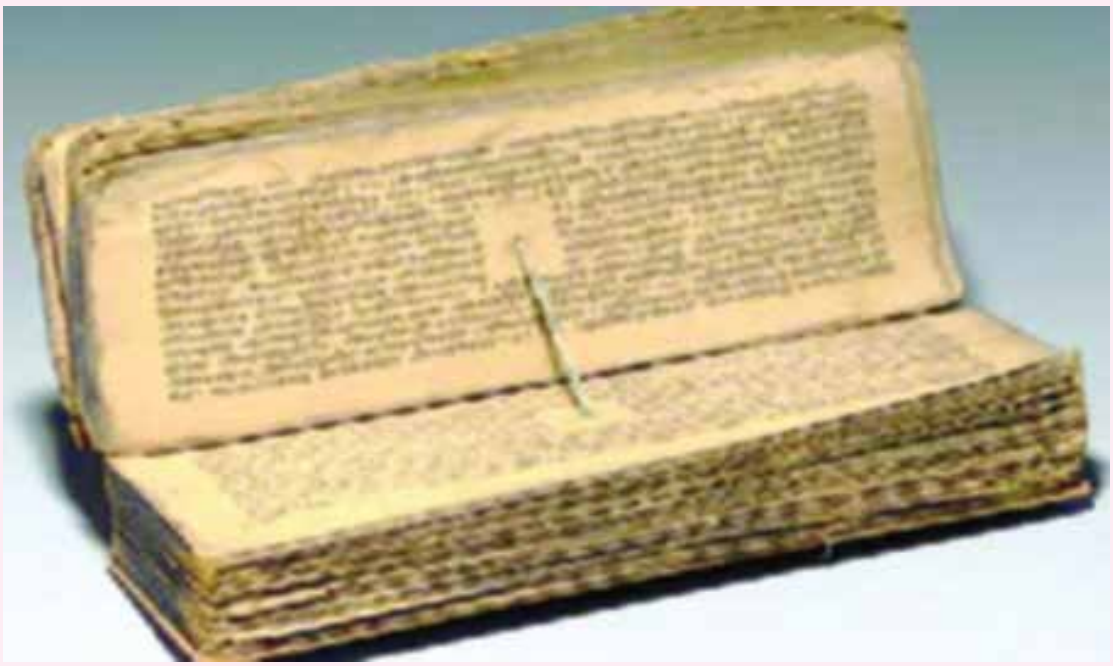

প্রাচীন পুঁথি

# সুন্দরবনে মধ্যযুগীয় স্থাপনা

শরীফউদ্দিন হাওলাদার

গহিন বন, চারদিকে ঘন গাছের সারি। এরই মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ইট-পাথরের প্রাচীন এক মন্দির। সেটি প্রায় ৪০০ বছরের পুরনো বলে মনে করছেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা। এত বছর ধরে ওই মন্দিরটি লোকচক্ষুর আড়ালে থাকলেও, এবার তা পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত করতে যাচ্ছে বন বিভাগ।

খুলনা শহর থেকে নদী পথে প্রায় ৮৫ কিলোমিটার দূরে শিবসা নদীর পূর্বের পাড়ে রয়েছে সেখের খাল। তার কিছুটা দূরে এগিয়ে কালির খাল। এই দুই খালের মধ্যবর্তী স্থানটি সেখের টেক নামে পরিচিত। এটি সুন্দরবনের পশ্চিম বন বিভাগের খুলনা রেঞ্জের কালাবগি ফরেস্ট স্টেশনের আদাচাই টহল ফাঁড়ির ১৬ নং কম্পার্টমেন্ট এলাকাটি জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে মধ্যযুগীয় স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ ইটের দেয়াল ও ঢিবি। তবে দণ্ডায়মান স্থাপনা হিসেবে এখন শুধু টিকে আছে কালি মন্দিরটি।

সম্প্রতি বন বিভাগের সহায়তায় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর খুলনার একটি দল ওই মন্দিরটি ও আশপাশের প্রাচীন স্থাপনা পরিদর্শন করেছে। যেহেতু মন্দিরটি এখনো অক্ষত আছে, তাই সেখান থেকে নিয়ে আসা মাপের ভিত্তিতে ওই মন্দিরের একটি নকশাও তৈরি করেছেন

ওই দপ্তরের কর্মকর্তারা। ওই নকশা অনুযায়ী, মন্দিরের বাইরের অংশ ৬৫৫ সেন্টিমিটার বর্গাকার। আর ভেতরের অংশ ৩২৫ সেন্টিমিটার বর্গাকার। দেয়ালের পুরত্ব ১৬৫ সেন্টিমিটার। ভেতরে উত্তর দিকে একটি ছোটো কুঠরি রয়েছে। দক্ষিণ ও পশ্চিম পাশে রয়েছে ৯৭ সেন্টিমিটার চওড়া দুটি প্রবেশপথ। মন্দিরের ছাদ চারচালা রীতিতে এক গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। এতে মোট চার ধরনের ইট ব্যবহার করা হয়েছে। যার পরিমাপ হলো, ২০x১৫x৪ সেমি, ২০x১৫x৪.৫ সেমি, ১৬x১২x৪ সেমি ও ১৬x১২x৫ সেমি। নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে পাতলা ইট। মন্দিরের বাইরের দিকে জ্যামিতিক নকশা, ফুল-লতা-পাতা সংবলিত পোড়ামাটির অলংকৃত ইট ব্যবহার করা হয়েছে। মন্দির তৈরিতে স্থানীয় শামুকের তৈরি চুন ও শিবসা নদীর বালু ব্যবহার করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। মন্দিরটির চূড়া বিভিন্ন ধরনের গাছপালায় পরিপূর্ণ। রোদ প্রবেশ করতে না পারায় স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে মন্দিরের দেয়াল।

সুন্দরবনের সবচেয়ে বিখ্যাত পুরনো স্থাপনা হিসেবে ১৯১৪ সালে প্রকাশিত সতিশ চন্দ্র মিত্রের লেখা যশোর-খুলনার ইতিহাস গ্রন্থের প্রথম খণ্ড বইতে সেখের টেকের কিছু তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। ওই বইয়ে লেখা হয়েছে, *'সেখের খাল ও কালির খালের মধ্যেবর্তী অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিবিশিষ্ট নিবিড় জঙ্গলকে সেখের টেক বলে। এখানে সুন্দরি গাছ যথেষ্ট, হরিণের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক এবং ব্যাঘ্রাদি (বাঘ) হিংস্র জন্তুর আমদানিও বেশি। সুতরাং আমাদিগকে এক প্রকার প্রাণ হাতে করিয়া এ বনে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল।... সেখের খালের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডান দিকে চতুর্থ পাশখালির পার্শ্বে এক স্থলে ইষ্টক-গৃহের ভগ্নাবশেষ ও কয়েকটি গাবগাছ দেখা যায়। তথা হইতে উঠিয়া বনের মধ্যে প্রায় এক মাইল গেলে, একটি দূর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বাওয়ালীরা ইহাকে 'বড় বাড়ি' বলে।'*

> "সম্ভবতঃ ইহাই মহারাজ প্রতাপাদিত্যের শিবস দূর্গ। দূর্গের অনেক স্থানে উচ্চ প্রাচীর এখনও বর্তমান। এই দূর্গের উত্তর-পূর্ব বা ঈশানকোণে একটি শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। সেখান হইতে দক্ষিণ-পূর্ব মুখে অগ্রসর হইলে, যেখানে সেখানে পুকুর ও পরে ৩টি ইষ্টকবাড়ী ও অসংখ্য বসতিভিট্টা পাওয়া যায়। বাড়িগুলির মাটির ঢিপি শত শত গাবগাছে ঢাকা রহিয়াছে। তাহা হইতে বাহির হইলে, একটু অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গায় একটি সুন্দর মন্দির দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয়। সুন্দরবনের ভীষণ অরণ্যনীর মধ্যে বিবিধ কারুকার্য্য-খচিত এবং অভগ্ন অবস্থায় দণ্ডায়মান এমন মন্দির আর দেখি নাই।"

এছাড়া এ.এফ.এম. আব্দুল জলীলের সুন্দরবনের ইতিহাস নামক গ্রন্থেও ওই স্থাপনার বর্ণনা করা হয়েছে। তার বইয়ে লেখা হয়েছে, শেখের টেক অঞ্চলটির ক্ষেত্র গড়ে ১০ বর্গ মাইল হবে। এককালে সেখানে বহুলোকের বসবাস ও গমনাগমন ছিল তা সহজেই বোঝা যায়। সম্ভবত মগ-পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচার হতে প্রজাগণকে রক্ষা করার জন্য মোগল শাসকেরা সেখানে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করেন এবং সুন্দর লোকালয় গড়ে তোলেন। মন্দিরটি হিন্দু রাজকর্মচারীদের জন্য নির্মিত হয়ে থাকবে। তবে বন বিভাগের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সুন্দরবনের ইতিহাসে এই প্রত্নস্থানটি বারোভূঁইয়া বা মোগলদের (১৬০০ শতাব্দী বা সমসাময়িক) সময়কালের বলে মনে করা হয়। এই অঞ্চলের ইমারতে ধ্বংসপ্রাপ্ত ঢিবি সেখের বাড়ি নামে পরিচিত হলেও ইতিহাস মতান্তে শিবসা দুর্গ বলা হয়েছে। ■

---

প্রাবন্ধিক

# জীববৈচিত্র্য দিবস

সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষ ও প্রকৃতির বসবাস একসাথে। একটি ছাড়া অন্যটির অস্তিত্ব অর্থহীন। কিন্তু মানুষ নিজের স্বার্থে নানাভাবে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করে নিজেদেরকেই প্রকৃতির বিপক্ষে দাঁড় করিয়েছে। জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে সচেতন করতে জাতিসংঘ প্রতিবছর ২২শে মে পরিবেশ কর্মসূচি উদ্‌যাপন করে আসছে। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'বাস্তবায়ন করি অঙ্গীকার, জীববৈচিত্র্য হবে পুনরুদ্ধার। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশে বন উজাড় হওয়ায় জীববৈচিত্র্য ধ্বংসসহ পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার হিসাবে বাংলাদেশে বার্ষিক বন উজাড় হওয়ার হার বৈশ্বিক গড়ের প্রায় দ্বিগুণ, ২ দশমিক ৬ শতাংশ। গত ১৮ বছরে বাংলাদেশে প্রায় ৬৬ বর্গকিলোমিটার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রেইন ফরেস্ট ধ্বংস হয়েছে। আর বন বিভাগের হিসাবে সারাদেশে দখল হয়ে গেছে প্রায় ৩ লাখ একর বনভূমি। চারদিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, নদীভাঙন, নদীর নাব্যতা কমে যাওয়া, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার, বন্য প্রাণীর সংকটাপন্ন অবস্থায় চলে যাওয়া সব মিলিয়ে দিবসটি গুরুত্ব বহন করে। প্রতিবছরের মতো এবারও বাংলাদেশে যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে দিবসটি পালিত

হয়েছে। আলোচনা অনুষ্ঠান, র‍্যালি, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতাসহ ছিল নানা আয়োজন। আগামী প্রজন্মের জন্য পরিবেশবান্ধব সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সবাইকে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের আহ্বান জানান বিশিষ্টজনরা।

স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ সেল ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ১৯৯২ সালের ২২শে মে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে বায়োডাইভার্সিটি (সিবিডি) চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এরপর ৫ই জুন ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির ধরিত্রী সম্মেলনে সিবিডি বিভিন্ন দেশের স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিশ্বের প্রায় ১৬৮টি দেশ সিবিডি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এবং সিবিডি ওই বছরের ২৯শে ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়। বর্তমানে এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশের সংখ্যা ১৯৫টি। ১৯৯৩ সালের শেষ দিকে দিবসটি পালনের জন্য ২৯শে ডিসেম্বর নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু পৃথিবীর অনেক দেশ এই দিবস পালন বন্ধ করে দিলে ২০০২ সালের ২২শে পালনের জন্য দিবসটি পুনঃনির্ধারণ করে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ। মূলত ১৯৯২ সালের ২২শে মে কেনিয়ার নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত জীববৈচিত্র্য বিষয়ক কনভেনশনে দিনটিকে আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।■

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

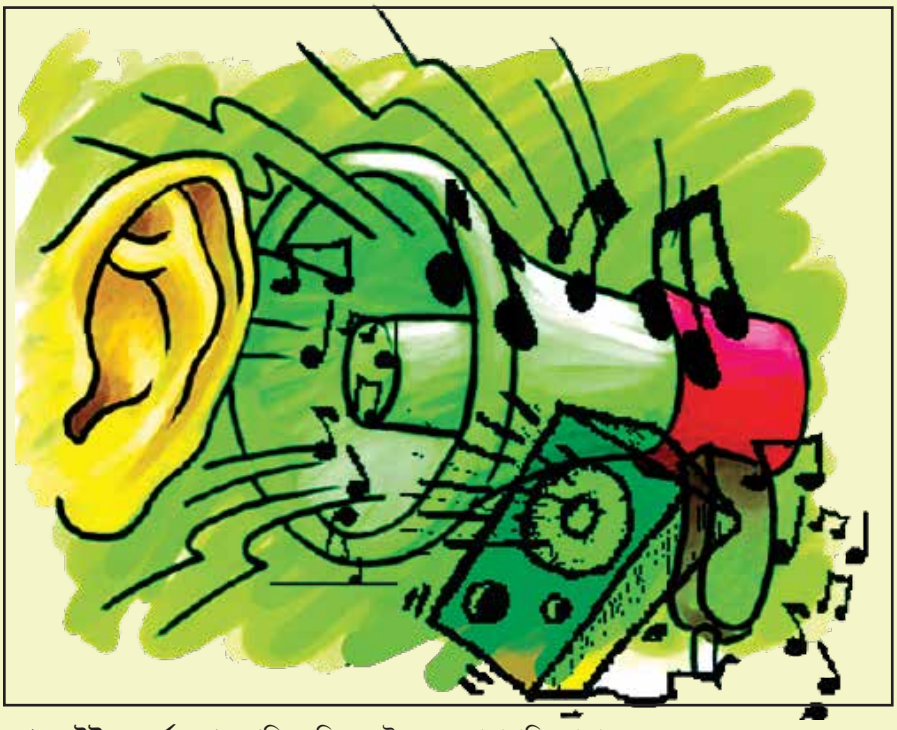

**মুহাম্মদ ইউনুস অর্ক,** দশম শ্রেণি, জুনিয়র এইড স্কুল, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা

# শব্দদূষণ এড়িয়ে চলি

রেবেকা জাহান

শব্দদূষণ একটি মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যা। ক্রমাগত শব্দদূষণের ফলে কানের টিস্যুগুলো আস্তে আস্তে বিকল হয়ে যায়, ফলে এক সময় মানুষ স্বাভাবিক শব্দ শুনতে পায় না। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিশুরা। শব্দদূষণের কারণে শিশুর মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় ও তারা লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে পড়ে।

আমরা অনেকেই জানিনা যে, তিন বছর বয়সের নিচে কোনো শিশুর কানে যদি খুব কাছ থেকে ১০০ ডেসিবেল শব্দ আসে তাহলে তার শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যেখানে একটি সাধারণ সিটির শব্দদূষণের মাত্রা ৫০ ডেসিবেল হওয়া উচিত, সেই জায়গায় আমাদের ঢাকার শব্দদূষণের মাত্রা দ্বিগুণেরও বেশি, অর্থাৎ ১১৯ ডেসিবেল।

পরিবেশেবাদী ও বিশেষজ্ঞদের মতে, শব্দদূষণের প্রধান কারণগুলো হলো- যানবাহনের জোরালো হর্ন ও ইঞ্জিনের শব্দ, যানবাহন চলাচলের শব্দ, বিভিন্ন নির্মাণ কাজের শব্দ, মেশিনে ইট ও পাথর ভাঙার শব্দ, ভবন ভাঙার শব্দ, কলকারখানা থেকে নির্গত শব্দ, গ্রিলের দোকানে হাতুড়ি পেটানোর শব্দ, জেনারেটরের শব্দ, নির্বিচারে লাউড স্পিকারের শব্দ, অডিও ক্যাসেটের দোকানে উচ্চ আওয়াজে গান বাজানোর শব্দ, উড়োজাহাজের শব্দ ইত্যাদি।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, শব্দদূষণ শিশু ও গর্ভবতী মা এবং হৃদরোগীদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। আকস্মিক উচ্চ মাত্রার শব্দ মানবদেহে রক্তচাপ ও হৃদকম্পন বাড়িয়ে দেয়, মাংসপেশীর সংকোচন করে এবং পরিপাকে বিঘ্ন ঘটায়। এছাড়াও শ্রবণশক্তি কমে যায়, এমনকি বধির হওয়ার মতো অবস্থারও সৃষ্টি হতে পারে, এছাড়া মাথা ব্যথা, বদহজম, অনিদ্রা, মনোযোগ কমে যাওয়া, খিটখিটে মেজাজ, বিরক্তিবোধ এমনকি মস্তিষ্কের রোগও হতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, শব্দের মাত্রা রাত ও দিনে ৪০ থেকে ৫০ ডেসিবেলের মধ্যে থাকবে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫-এর ক্ষমতাবলে ২০০৬ সালে শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা প্রণয়ন করে। এতে এলাকা ভিত্তিক শব্দের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা অনুসারে, নিরব এলাকায় দিনে ৪৫ ডেসিবেল ও রাতে ৩৫ ডেসিবেলের মধ্যে শব্দের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আবাসিক এলাকায় দিনে ৫০ ও রাতে ৪০ ডেসিবেল। বাণিজ্যিক এলাকায় দিনে ৭০ ও রাতে ৬০ ডেসিবেল এবং শিল্প এলাকায় দিনে ৭৫ ডেসিবেল ও রাতে ৭০ ডেসিবেল শব্দের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অথচ বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের হিসেবে দেখা যায়, শব্দদূষণের মাত্রা ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় ৮৬ ডেসিবেল থেকে ১১০ ডেসিবেল পর্যন্ত রয়েছে।

এ বিধিমালা লঙ্ঘনের দায়ে কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে প্রথমবার অপরাধের জন্য এক মাস কারাদণ্ড বা পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান আছে। পরবর্তীতে একই অপরাধে ছয় মাস কারাদণ্ড বা ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান যুক্ত হয়েছে এ আইনে।

বিশেষজ্ঞদের মতে এভাবে শব্দদূষণ চলতে থাকলে রাজধানীতে শিশুদের মধ্যে বধিরতার হার ক্রমান্বয়ে বাড়বে এবং তারা লেখাপড়ায় অমনোযোগী ও বিকার মানসিকতাসম্পন্ন হয়ে গড়ে উঠবে।

তবে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ শুধু পরিবেশ অধিদপ্তরের একার পক্ষে সম্ভব নয়। বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানকে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই আমাদের আগামী দিনের শিশুরা সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেড়ে উঠবে। ■

প্রাবন্ধিক

# ফোর্বসে বাংলাদেশের ৭ তরুণ উদ্যোক্তা

ইব্রাহিম রাজু

করোনার পর বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের কারণে বড়ো ধরনের চ্যালেঞ্জে পড়ে যায় এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের তরুণ উদ্যোক্তারা। তবুও তারা কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এগিয়ে যায় দুর্বার গতিতে। এ বছর ৩০ বছরের কম বয়েসি তরুণদের মধ্য থেকে সেরাদের বেছে নিয়েছে মার্কিন সাময়িকী ফোর্বস। এ তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন বাংলাদেশের ৭ জন তরুণ-তরুণী। তারা হলেন আজিজ আরমান, দীপ্ত সাহা, রুবাইয়াত ফারহান, তাসফিয়া তাসবিন, জাহ্নবী রহমান, আনোয়ার সায়েফ ও সারাবন তহুরা।

গত ১৮ই মে প্রখ্যাত এই সাময়িকীর ওয়েবসাইটে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ৩০০ তরুণ উদ্যোক্তা, নেতা ও প্রবর্তক জায়গা করে নিয়েছেন এই তালিকায়। তাঁদের সবার বয়স ৩০ বছরের নিচে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং চ্যালেঞ্জিং পরিবেশের মাঝেও তাঁরা ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসছেন এবং নতুন নতুন উদ্ভাবন নিয়ে কাজ করছেন।

তালিকায় কনজ্যুমার টেকনোলজিতে (ভোক্তা প্রযুক্তি) জায়গা করে নিয়েছেন আজিজ রহমান ও দীপ্ত সাহা। মিডিয়া, মার্কেটিং অ্যান্ড অ্যাডভারটাইজিং (গণমাধ্যম, বিপণন ও বিজ্ঞাপন) ক্যাটাগরিতে রুবাইয়াত ফারহান ও তাসফিয়া তাসবিন। সোশ্যাল ইমপ্যাক্টে (সামাজিক প্রভাব) জাহ্নবী রহমান, আনোয়ার সায়েফ এবং সারাবন তহুরা এ সম্মান অর্জন করেছেন।

**আজিজ আরমান** [প্রতিষ্ঠাতা, যাত্রী]: বাংলাদেশের যানজট নির্মূলের লক্ষ্যে প্রযুক্তিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান যাত্রী প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উদ্ভাবিত যাত্রী প্রতিষ্ঠানের ই-টিকিটিং সিস্টেম ব্যবহার করে রাজধানীতে ৫ হাজার

৬৫০টি বাস চলাচল করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঢাকা বাস মালিক সমিতি।

**দীপ্ত সাহা** [সহপ্রতিষ্ঠাতা, অ্যাগ্রো শিফট টেকনোলজিস] : কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি গ্রাহকের কাছে কৃষিপণ্য পৌঁছে দিতে কাজ করে কৃষিভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম অ্যাগ্রো শিফট টেকনোলজিস। এর মাধ্যমে কৃষক তাঁর উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পেয়ে থাকেন। তিনি ২০২২ সালে চালু হওয়া প্রতিষ্ঠানটির চিফ অপারেটিং অফিসার।

**রুবাইয়াত ফারহান ও তাসফিয়া তাসবিন** [প্রতিষ্ঠাতা, মার্কোপলো ডট এআই]: মাঝারি ও ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ডিজিটাল মার্কেটিং পরিষেবা দিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মার্কোপলো ডট এআই। এতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে সহজেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মার্কেটিং করা সম্ভব হচ্ছে।

**জাহ্নবী রহমান** [সহপ্রতিষ্ঠাতা, রিলাক্সি] : মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান রিলাক্সি। ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষের কাছে মানসিক চিকিৎসা সেবা প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এ প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক সেবা ফ্রিতেও মিলে।

**আনোয়ার সায়েফ ও সারাবন তহুরা** [প্রতিষ্ঠাতা, টার্টল ভেঞ্চার] : স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর্থিক সহায়তা, পরামর্শ, বৈশ্বিক নেটওয়ার্কের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং কৌশলগত সহায়তা দিয়ে থাকে এ প্রতিষ্ঠানটি। বাংলাদেশে এরাই প্রথম এ সেবা প্রদান করছে। ২০০৮ সালে সূচনার পর থেকে এ পর্যন্ত ৯০ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করেছে টার্টল। ■

# ফল

মিনহাজুল নূর

খাবো মোরা বেশি করে
আছে যত মৌসুমী ফল
নিয়মিত খেলে পাবো
শরীরে অনেক বল।

ফল খেলে চেহারাটা
করবে যে ঝিকমিক
নিয়ম মেনে খেলে ফল
দেহ থাকবে ঠিক।

একাদশ শ্রেণি
টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চাঁদপুর

# গরমে শিশুর যত্ন

অতিরিক্ত গরমে কিছু নিয়ম মেনে চললে ভালোভাবেই শিশুর যত্ন নেওয়া যায়। এড়ানো যায় জটিলতা। শিশুদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কম থাকে বলে তারা সহজেই মৌসুমি নানা রোগে আক্রান্ত হয়। গরমের এ সময়ে শিশুদের মধ্যে সচরাচর পানিস্বল্পতা, জ্বর, সর্দি-কাশি-নিউমোনিয়া, ঘামাচি, ডায়াপার র‍্যাশ দেখা দেয়।

### পানিশূন্যতা

এ সময় শিশু ডিহাইড্রেশনে পড়তে পারে। মৃদু বা মাঝারি পানিশূন্যতায় জিভ শুকিয়ে যায়, কাঁদলে চোখ দিয়ে সামান্য পানি পড়ে, হৃৎস্পন্দন বাড়ে, ছয় থেকে আট ঘণ্টায় একবারও প্রস্রাব হয় না; এসব উপসর্গ দেখা দেয়। মারাত্মক পানিশূন্যতা হলেপেটের চামড়া, বাহু, পায়ের চামড়া শুকনো ও ঢিলা হয়ে যায়, শরীর নিস্তেজ ও ঘুম ঘুম ভাব থাকে, চোখ গর্তে ঢুকে যায় এবং সদ্যোজাত শিশুর মাথার চাঁদি দেবে যায়।

অল্প পানিশূন্যতা দেখা দিলে বারবার তরল খাবার বা পানীয় খাওয়াতে হবে। ১৫ থেকে ২০ মিনিট পরপর বয়স অনুযায়ী এক-দুই চামচ করে স্যালাইন খাওয়াতে হবে।

### জ্বর

গরমের সময় শিশুদের জ্বরের হার বাড়ে। তবে শিশু যদি খেলাধুলা করে, ভালোভাবে খেতে পারে, দুধ পান করতে পারে, ত্বকের রং স্বাভাবিক থাকে, হাসিখুশি ভাব থাকে এবং জ্বর কেটে গেলে স্বাভাবিক দেখায় তবে বুঝতে হবে এ জ্বর মারাত্মক নয়।

জ্বরের শুরুতেই ওষুধ খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। বিশেষ করে দুই মাসের নিচের বয়সি শিশুদের জ্বরের

সিরাপ না দিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে আগে। তিন মাস থেকে তিন বছর বয়সে যদি জ্বর ১০২ ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশি থাকে এবং শিশু কষ্ট পাচ্ছে মনে হয়, তবে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ শুরু করা উচিত।

জ্বর কমাতে কুসুম গরম পানিতে নরম কাপড় ভিজিয়ে শিশুর পুরো শরীর স্পঞ্জ করে দিতে হবে। আইসপ্যাক বা ঠান্ডা পানি ব্যবহার করা উচিত নয়। এতে অনেক সময় জ্বর বেড়ে যায়। পাতলা ও ঢিলা পোশাক পরাতে হবে। ঘরের তাপমাত্রা যেন বেশি গরম বা শীতল না হয়। জ্বরের সঙ্গে বমি পাতলা পায়খানা থাকলে স্যালাইন খাওয়াতে হবে। আপেল জুস বা ফলের রস দেওয়া যাবে না।

**সর্দি-কাশি-নিউমোনিয়া**

সর্দি হলে নাক বন্ধ হয়ে যায়। ডাক্তারের পরামর্শ মতে- নরসল জাতীয় ড্রপ ঘুমানো ও খাওয়ানোর আগে নাকে ব্যবহার করা ভালো। হালকা গরম পানিতে এক চিমটি লবণ মিশিয়ে পরিষ্কার নরম কাপড়ে ভিজিয়ে নাকে দেওয়া যায়। মৌসুমি ফল তরমুজ, ডাব, আনারস, পেয়ারা, কাঁঠাল, আম ইত্যাদি খাওয়ানো যেতে পারে। কাশি হলে ডাক্তারের পরামর্শ মতো চিকিৎসা করাতে হবে। তা না হলে জটিলতা তৈরি হতে পারে। কাশিতে লেবুর রস মেশানো গরম পানি, তুলসী পাতার রস এবং একটু বড়ো শিশুদের লিকার চা দেওয়া ভালো।

**ডায়াপার র‍্যাশ**

আগের তুলনায় শিশুদের ডায়াপার র‍্যাশের সমস্যা বেশি দেখা যাচ্ছে। গরমকালে এটা বাড়ে। শিশুর ভিজে যাওয়া ডায়াপারে থাকা ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে প্রস্রাবের নির্গত অ্যামোনিয়ার সংস্পর্শে লাল রঙের জ্বালাদায়ক গোটা দেখা দেয়। শিশুর ন্যাপকিন যত্নসহকারে ধুতে হবে। কাঁথা, কাপড় এগুলো গরম পানিতে ফুটিয়ে রোদে শুকাতে হবে। র‍্যাশ আক্রান্ত অংশটি গোসলের সাবান ও পরিষ্কার ফোটানো পানি দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে। ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাকজাতীয় জীবাণুর সংক্রমণ ঘটলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া দরকার।

র‍্যাশ প্রতিরোধের সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে বেশি সময় শিশুকে প্রস্রাবের মধ্যে ফেলে না রাখা। প্লাস্টিকের ন্যাপকিন ব্যবহার না করে শোষক কাপড়ের ন্যাপকিন ব্যবহার করা উচিত।

**ঘামাচি**

বেশি ঘেমে সংশ্লিষ্ট গ্ল্যান্ডগুলোর নালিমুখ বন্ধ হওয়ার ফলে ঘামাচির সৃষ্টি হয়। সাধারণ ঘামাচি দেহের বড়ো অংশজুড়ে থাকে। কখনোবা ঘামাচি লাল লাল গোটার মতো ঘাড়ে, গলায়, পিঠে, বুকে ওঠে। কখনো ছত্রাকজাতীয় জীবাণুর সংক্রমণ বা চামড়ার অন্যান্য কিছু অসুখ বলে মনে হতে পারে। ঘামাচি প্রতিরোধে শিশুকে যতটা সম্ভব ঠান্ডার মধ্যে রাখা উচিত। সিনথিটিক কাপড়ের পোশাক পরানো বা রাবার ও প্লাস্টিকের সিটের ওপর শোয়ানো যাবে না। বারবার শিশুর গা ঠান্ডা পানিতে মুছিয়ে দিলেও ঘামাচি থেকে বাঁচা যায়।■

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

# ইজিএমওতে আমাদের অর্জন

মধ্য ইউরোপের দেশ স্লোভেনিয়ায় ১৪ থেকে ১৮ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত ইউরোপিয়ান গার্লস ম্যাথমেটিক্যাল অলিম্পিয়াডে (ইজিএমও) প্রথমবারের মতো সশরীর অংশগ্রহণের সুযোগ পায় বাংলাদেশের একটি দল। আর প্রথমবার অংশ নিয়েই বাংলাদেশের মেয়েরা চমক সৃষ্টি করে একটি রৌপ্য ও তিনটি ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে। নুজহাত আহমেদ পেয়েছে রৌপ্য আর আরিফা আলম, আফসানা আকতার ও সানিভা রাকিব পায় ব্রোঞ্জপদক।

এর আগে দুবার অনলাইনে এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে বাংলাদেশের দলটি। দুবারই পদক পেয়ে সামনের পথ অনেকটা উজ্জ্বল করে রেখেছিল তারা। এ প্রতিযোগিতায় ৫৫টি দেশের মধ্যে ২০তম হয়েছে বাংলাদেশ দল। পাশাপাশি প্রতিযোগিতার সবচেয়ে কঠিন ৬ নম্বর জ্যামিতিক সমস্যার সমাধান করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে তারা। এবারের ইজিএমওতে বাংলাদেশ টিমে দলনেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তামান্না ইসলাম। বলা হয়, মেয়েদের নিয়ে আয়োজিত গণিত প্রতিযোগিতাগুলোর মধ্যে ইউরোপিয়ান গার্লস ম্যাথমেটিক্যাল অলিম্পিয়াড (ইজিএমও) সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের প্রায় অনুরূপ এই প্রতিযোগিতায় বুদ্ধি ও গাণিতিক দক্ষতার লড়াইয়ে এবার অংশ নেয় সারা বিশ্বের ৫৫টি দেশের ২০ বছরের কম বয়সি ২১৪ জন নারী। ইজিএমওতে অংশ নিতে যাওয়ার আগে কয়েকটি ধাপে নির্বাচিত চারজনের দল নিয়ে দেশে আয়োজন করা হয় চার দিনের আবাসিক ক্যাম্প। প্রথম দুদিন ধরে চলে পরিচিতি পর্ব। এরপর পরীক্ষা। ১২ই এপ্রিল স্লোভেনিয়ার পথে রওনা হয় বাংলাদেশ দল। সালসা কর্মশালায় অংশগ্রহণ, নানা খেলাধুলা আর ধাঁধা সমাধানের মধ্য দিয়ে ভালো সময় কেটেছে তাদের।

সমাপনী অনুষ্ঠানে বিশ্বের বেশ কয়েকজন বড়ো মাপের গণিতবিদ হাজির হয়েছিলেন। ২০২২ সালের ফিল্ডস মেডেলপ্রাপ্ত (যেটাকে গণিতের সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার ধরা হয়) ইউক্রেনীয় গণিতবিদ মেরিনা ভিয়াজোভস্কাও ছিলেন। তাঁদের হাত থেকেই পদক গ্রহণ করে বাংলাদেশের মেয়েরা। দলের প্রত্যেকেই সমাপনীতে পদক পেয়েছে।

প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী

# দ শ দি গ ন্ত

## সর্বকনিষ্ঠ সিরিজ লেখক

গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে পৃথিবীর সবচেয়ে কনিষ্ঠ সিরিজ লেখক হিসেবে এবার বাংলাদেশি এক বন্ধুর নাম প্রকাশিত হয়েছে। পারিবারিক সূত্রে এ তথ্যটি পাওয়া যায়। নাম তার ঋতুরাজ ভৌমিক হৃদ্য। বয়স মাত্র ৯। ঋতুরাজ ২০২২ সালে 'Goodwill Factory' নামে একটি ইংরেজি গল্পের বই প্রকাশ করে। তারই ধারাবাহিকতায় এরপর 'Goodwill Factory' প্রকাশ হয়। তার লেখা গল্পগুলো সমাজ ও মানুষের চিন্তাধারা বদলাতে দারুণভাবে সহায়ক। ইতোমধ্যে তার বই ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। প্রতিটি শিশুর জন্য খুব শিক্ষণীয় এই সিরিজ বই। ঋতুরাজ ভৌমিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও খুব জনপ্রিয়। সে এবং তার বাবা মিলে 'বাপকা বেটা' নামে একটি পেইজ চালনা করে। যেখানে তারা অনেক শিক্ষণীয় কনটেন্ট প্রকাশ করে এবং গান গেয়েও ভিডিও আপলোড করে। ঋতুরাজ শিশুদের জন্য আদর্শ মডেল। তার বেড়ে ওঠা, শিক্ষা, কর্মকাণ্ড, জীবনবোধ যে-কোনো শিশুর জন্য অনুসরণীয়। সে শুধু তার পরিবারের নয় পুরো বাংলাদেশের গর্ব।

## চা দোকানি থেকে প্রধান শিক্ষক

চা বিক্রেতা থেকে স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক। বলছি ঠাকুরগাঁও এর চরভিটা গ্রামের এরফান আলীর কথা। ঠাকুরগাঁওয়ের হরিপুর উপজেলার প্রত্যন্ত একটি গ্রাম। প্রত্যন্ত এই এলাকায় শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে তিনি গড়ে তোলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়। নাম চরভিটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এটি জাতীয়করণ করা হয় ২০১৩ সালে। মাত্র নয় বছরের মাথায় এসে (২০২২ হিসেবে) বিদ্যালয়টি এবার দেশের শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পেল। এরফান আলী একসময় চা বিক্রেতা ছিলেন। তখন থেকেই তিনি স্বপ্ন দেখতেন শিক্ষকতা করার। এরপর পড়াশোনার পাশাপাশি নিজ জমিতে গড়ে তোলেন স্কুলটি। ২০০৮ সালে স্নাতক পাস করেন তিনি। এখন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হয়ে শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছেন। তিনিই প্রথম যিনি স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার বাড়ানো ও পড়াশোনায় মনোযোগী করতে নিজ উদ্যোগে চালু করেন শিক্ষার্থীদের দুপুরের খাবার। আনন্দ দিতে স্কুলের চারপাশের প্রাচীরে নানা ধরনের শিক্ষণীয় বিষয়সহ রয়েছে খেলাধুলার নানা উপকরণও।

## শতবর্ষী বাতি

একটি বাতি ১২০ বছর ধরে জ্বলছে! অবিশ্বাস্য হলেও ঘটনাটি সত্যি। শতবর্ষী বাতি হিসেবে পরিচিত বাল্বটি পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার লিভারমোর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে বাতিটি নিরবচ্ছিন্নভাবে এখনো জ্বলছে। ১৯০১ সালে ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের গ্যারেজের দরজার পেছনে লাগানো হয়েছিল বাতিটি। বাতিটি লাগানোর উদ্দেশ্য ছিল অন্ধকারে গ্যারেজে থাকা দমকল কর্মীদের সরঞ্জাম দ্রুত খুঁজে পাওয়া। তবে মজার বিষয় হচ্ছে, ধীরে ধীরে বাতিটি দমকল কর্মীদের কাছে শুভ কামনার প্রতীক হয়ে উঠে। আর তাই আগুন নেভানোর সরঞ্জাম নিয়ে অভিযানে যাওয়ার আগে দমকল কর্মীরা বাতিটি দেখে বের হতো। এটি সপ্তাহে সাতদিন ২৪ ঘণ্টা কাজ করছে। কার্বন ফিলামেন্টের তৈরি বাতিটি (লাইট বাল্ব) মাঝখানে কেবল লোডশেডিংয়ের কারণে বন্ধ হয়েছিল। ১৯৭২ সালে সবচেয়ে প্রাচীনতম বাতির স্বীকৃতি হিসেবে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসেও নাম লিখিয়েছে বাতিটি।

## ঘড়ির মধ্যে মানুষ

ঘড়ির মধ্যে আস্ত এক মানুষ! ঘণ্টা-মিনিটের কাটা মুছে আবার নতুন করে একেই চলেছে সে। নেই কোনো বিশ্রাম। কী বন্ধুরা অবাক হচ্ছো? এও কি সম্ভব? না, আসল মানুষ ভাবলে ভুল করবে। নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডাম শহরের শিফল এয়ারপোর্টের ইন্টারন্যাশনাল টার্মিনালে গেলে দেখা যাবে এই ঘড়িটি। ভেতরের মানুষটি আসলে ১২ঘণ্টার একটি লুপ ভিডিও বাদে আর কিছুই না। এই ঘড়ির স্রষ্টা ডাচ শিল্পী মার্টিন বাস। মূলত ১২ ঘণ্টার একটানা একটি ভিডিও তৈরি করে সেটিই এই ট্রান্সলুসেন্ট ঘড়ির মধ্যে চালানো হয়। আর এতেই ভিতরে মানুষ আছে এমন ইলুশনের তৈরি হয়। মার্টিন ২০১৬ সালে এই ঘড়িটি তৈরি করেন। তার আগেও পৃথিবীর অনেক জায়গায় তিনি একই ধরনের ঘড়ি তৈরি করেছেন। এটা একটা ডিজিটাল ঘড়ি। অপেক্ষারত যাত্রীদের একঘেয়েমি দূর করতে এই ব্যবস্থা। যা একটি বিশ্বাসযোগ্য বিভ্রম দেয় যে, একজন মানুষ স্বচ্ছ ঘড়ির ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটির পরনে নীল রঙের ওভারঅল, পকেটে হলুদ একটি ন্যাকড়া এবং একটি লাল বালতি। মানুষটি হাত ঘুরাতে ঘুরাতে কাজে ব্যস্ত।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

**মৌমিতা আক্তার বন্যা**, ষষ্ঠ শ্রেণি, নামা কৈয়াকুড়ি উচ্চ বিদ্যালয়, নকলা, শেরপুর

## তোমাদের জন্য সুখবর

বন্ধুরা, নবারুণের 'বুদ্ধিতে ধার দাও' এতদিন যারা উত্তর পাঠিয়েছ কিন্তু কোনো উপহার পাওনি এবার উপহারের পালা। সঠিক উত্তর দাতাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে বিজয়ীকে দেওয়া হবে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা প্রাইজবন্ড। এজন্য নবারুণ পত্রিকার পাতা (ফটোকপি প্রযোজ্য নয়) পূরণ করে বন্ধ খামে পাঠাতে হবে। খামের ওপর অবশ্যই লিখতে হবে 'বুদ্ধিতে ধার দাও'। পাঠাবে এই ঠিকানায়–

সম্পাদক, নবারুণ
**চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর**
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড
ঢাকা-১০০০

# বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

## শব্দধাঁধা

**পাশাপাশি:** ১. বিশ্ব শান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধুকে যে পুরস্কার প্রদান করা হয়, ৫.পাখির পাখনা, ৬. বেশির বিপরীত শব্দ, ৭.টাকা তৈরির কারখানা, ৯.উৎসাহপূর্ণ প্রস্তুতি, ১১.এক ধরনের পাখি, ১২.বন্যা, ১৩.মূল

**উপর-নিচ:** ২.ইতালির একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী, ৩.সাগরকন্যা, ৪.আগুন নেভানো এবং পানি উঠানোর যন্ত্রবিশেষ, ৮.বাংলাদেশের একটি নদী, ৯.আপনমনে অস্পষ্ট ও অনুচ্চ উক্তি, ১১. পর্যায় সারণীর ৫০তম মৌলিক পদার্থ

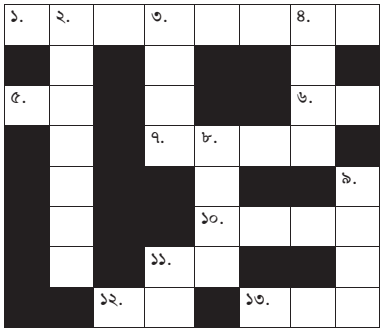

## ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যে সব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেয়া হলো।

**সংকেত:** পদার্থবিজ্ঞান, শব্দার্থ
গুড়, শকুন্তলা, অনন্ত
জ্ঞানবিজ্ঞান, ণত্ববিধান
বেগুন, চীন

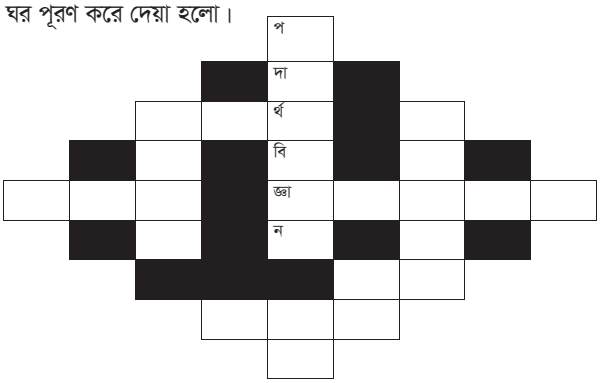


## নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপর-নিচ আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৬৯ | | ৬৭ | ৫৮ | | ৫৬ | ৫ | | ৭ |
| | ৮১ | | | ৬০ | | | ৩ | |
| | | | ৬৪ | | | ১ | | |
| | | ৭৮ | | ৬২ | | | ১৫ | ১০ |
| | ৭৬ | | | | ৫২ | | ১৪ | |
| ৭৪ | | | ৪৯ | ৩৪ | | | | ১২ |
| ৪৩ | | ৪৭ | | ৩৫ | ৩২ | ১৯ | | ২১ |
| | ৪৫ | | ৩৭ | | ৩১ | | ২৫ | |
| ৪১ | | ৩৯ | | ২৯ | | ২৭ | | ২৩ |

## ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২ | * | | + | ১ | = | |
| + | | * | | * | | + |
| | * | ৩ | - | | = | ৯ |
| - | | - | | - | | - |
| ৩ | + | | + | ১ | = | |
| = | | = | | = | | = |
| | * | ৩ | - | | = | ৭ |

# এপ্রিল মাসের সমাধান

## শব্দধাঁধা

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বৈ | | নৌ | কা | বা | ই | চ |
| শা | লি | ক | রি | | | ট্ট |
| খ | | বু | ক | | | গ্রা |
| | | ত | র | | আ | ম |
| গা | জ | র | | | না | |
| য় | | | কু | মি | র | |
| ক | থা | | পি | ঠা | | |
| | লা | | র | সি | ক | তা |

## ছক মিলাও

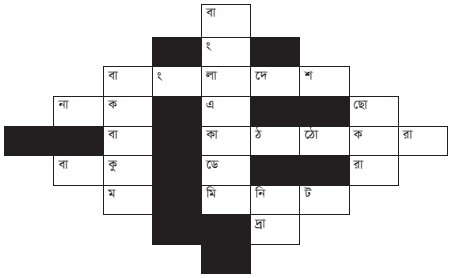


## নাম্ব্রিক্স

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৭৭ | ৭৮ | ৭৯ | ৪৪ | ৪৩ | ৮ | ৭ | ৬ | ৫ |
| ৭৬ | ৮১ | ৮০ | ৪৫ | ৪২ | ৯ | ১০ | ৩ | ৪ |
| ৭৫ | ৭২ | ৭১ | ৪৬ | ৪১ | ৪০ | ১১ | ২ | ১ |
| ৭৪ | ৭৩ | ৭০ | ৪৭ | ৪৮ | ৩৯ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| ৬৭ | ৬৮ | ৬৯ | ৫০ | ৪৯ | ৩৮ | ২৭ | ২৬ | ১৫ |
| ৬৬ | ৬৩ | ৬২ | ৫১ | ৩৬ | ৩৭ | ২৮ | ২৫ | ১৬ |
| ৬৫ | ৬৪ | ৬১ | ৫২ | ৩৫ | ৩০ | ২৯ | ২৪ | ১৭ |
| ৫৮ | ৫৯ | ৬০ | ৫৩ | ৩৪ | ৩১ | ২২ | ২৩ | ১৮ |
| ৫৭ | ৫৬ | ৫৫ | ৫৪ | ৩৩ | ৩২ | ২১ | ২০ | ১৯ |

## ব্রেইন ইকুয়েশন

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | * | ৬ | + | ২ | = | ৮ |
| + | | / | | + | | - |
| ৪ | / | ২ | + | ১ | = | ৩ |
| - | | + | | + | | - |
| ৩ | * | ২ | - | ৪ | = | ২ |
| = | | = | | = | | = |
| ২ | * | ৫ | - | ৭ | = | ৩ |

# ছোটোদের আঁকা

**স্নেহা চৌধুরী,** সপ্তম শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল, ঢাকা

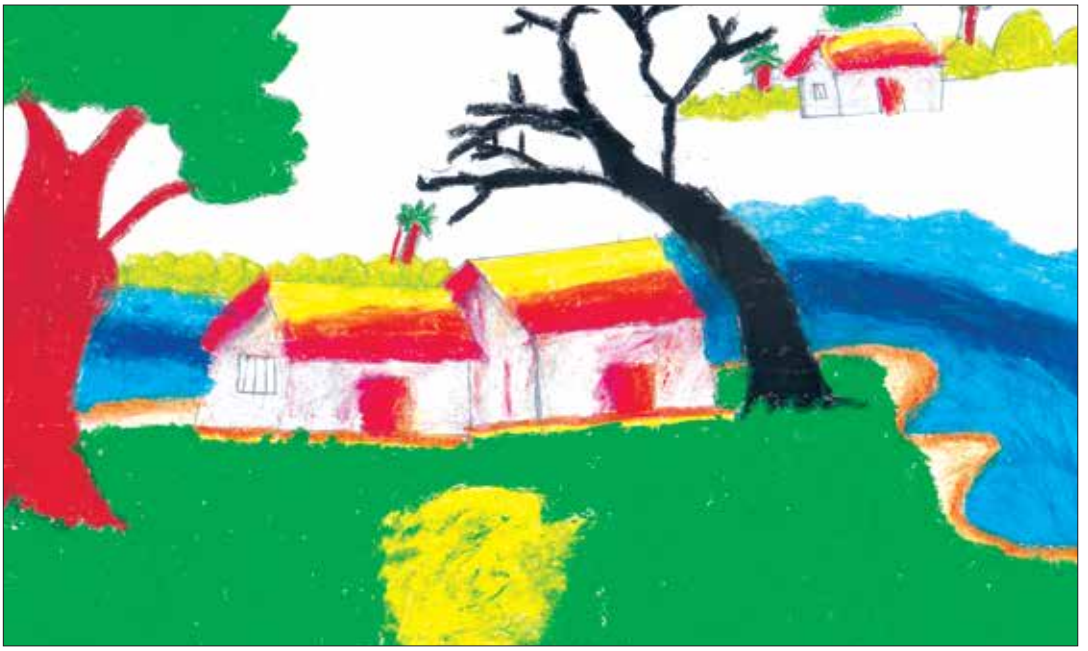

**সিরাজুল মুনিরা বিভা,** কেজি ওয়ান, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুল, ঢাকা

# ছোটোদের আঁকা

**রিজওয়ান আল রাহাত**, চতুর্থ শ্রেণি, মানিকনগর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

**সায়মা আনজুম**, নবম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল, শেরপুর

**সালিমা রহমান**, দশম শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

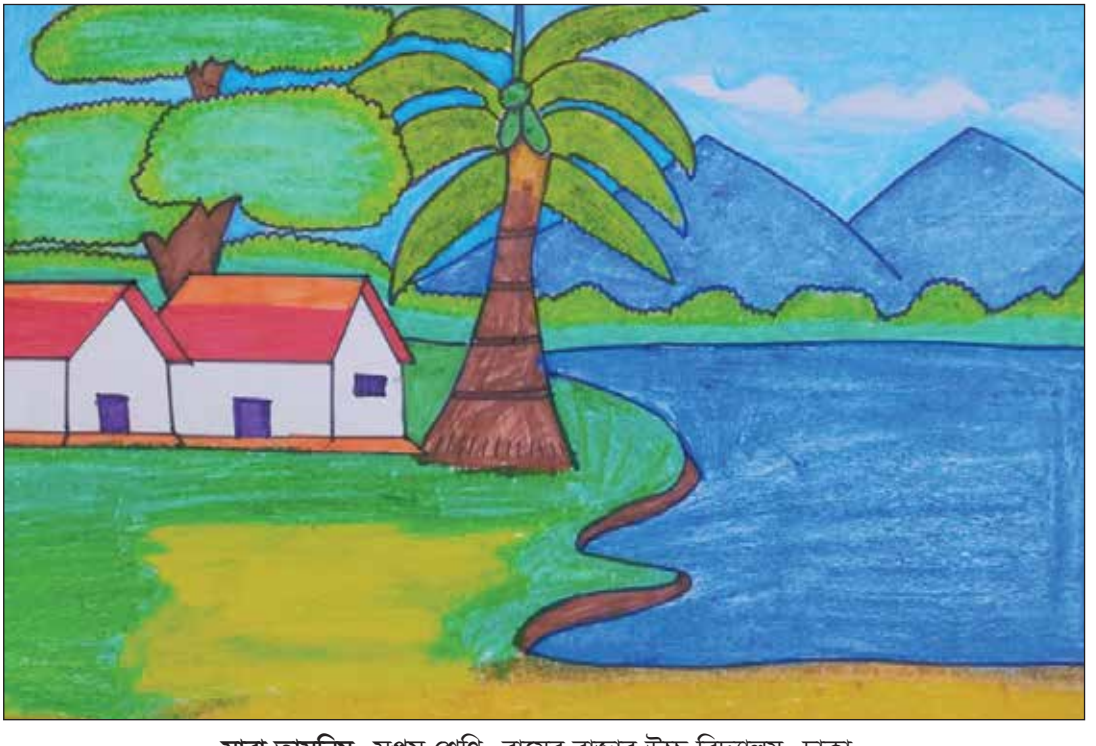

**সাবা তাসনিম**, সপ্তম শ্রেণি, রায়ের বাজার উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-47, No-11, May 2023, Tk-20.00
Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022

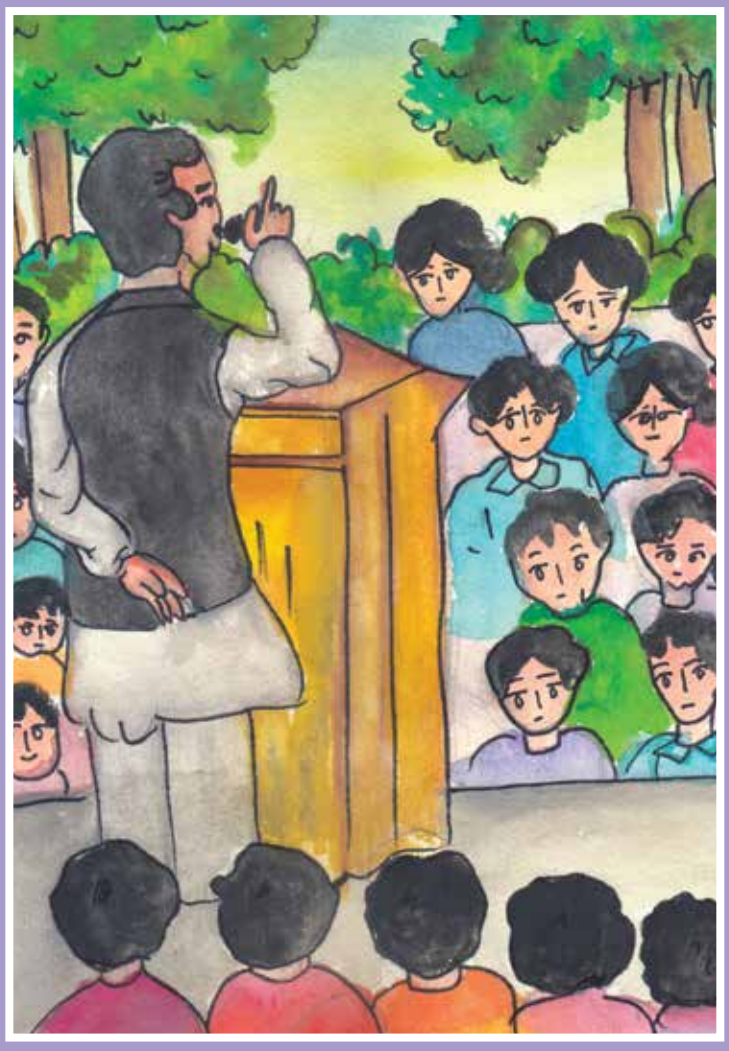

**আফিফা মাইমুনা**, দশম শ্রেণি, মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

**চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর**
**তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়**
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা